বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত

শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান :
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীমণীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত

১২৪।৫ বি রসা রোড, কলিকাতা

দোল পূর্ণিমা, ১৩৫৪

পাঁচ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর : শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দে

নিউ মদন প্রেস

৯৫, বেচু চ্যাটার্জ্জি স্ট্রীট, কলিকাতা

মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতির উদ্দেশে

মহাত্মাজী—

আপনি জগৎ সমীপে নিজের বিরাট জীবনে যে অপূর্ব্ব মহিমাময় নাটক রচনা করিয়াছেন, ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। বাঙ্গলাকে আপনি বরাবর স্নেহ করিতেন, বাঙ্গলার দেশবন্ধু আপনার অকৃত্রিম সুহৃদ ছিলেন, কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমান প্রীতি স্থাপন করিয়া বাঙ্গলাকে আপনি গৌরবান্বিত করিয়াছেন। হে বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব! আপনার মহাপ্রয়াণের পরে আমার রচিত প্রথম গ্রন্থই সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতে আমার ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ আপনার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি রূপে উৎসর্গ করিলাম।

দোলপূর্ণিমা
১৩৫৪

দীন সেবক
শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত

ভূমিকা

এই বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গলা নাটক গত একশত বৎসরের মধ্যে যেরূপ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, অন্য কোন দেশে এত অল্প সময় মধ্যে সেরূপ হয় নাই। বাঙ্গলা দেশে এমন কয়েকজন নাট্যকার আছেন যাহাদের নাটক জগতের যে কোন দেশের নাটক হইতেও কম শ্লাঘনীয় নয়। তথাপি পরিতাপের বিষয়, এ পর্য্যন্ত নাটকের ইতিহাস ছিল না এবং সাহিত্যরথীগণও নাটককে যেন উপেক্ষা করিয়াই থাকিতেন। তাই নাটকের বৈশিষ্ট্য দেখাইবার জন্য বহু দিন যাবৎ ইহার ইতিবৃত্ত সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ইতিমধ্যে অধ্যাপক অজিত মোহন ঘোষ একখানি বাঙ্গলা নাটকের ইতিহাস বাহির করিয়াছেন। মদ্-রচিত গ্রন্থখানি প্রস্তুত হইয়া আসিলেও অন্যান্য কাজ-কর্ম্মের চাপে ইহা প্রকাশিত হইতে পারে নাই। তিনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়া তাঁহার পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রয়াস আমি প্রশংসনীয় মনে করি। আমার পুস্তকে যে সমস্ত আবশ্যকীয় বিষয় আছে ও আমি যে ভাবে নাটকের চরিত্রাদি বুঝিয়াছি, তাহা সাধারণে উপস্থিত করিয়া নাট্য-ইতিহাস আরও সমৃদ্ধিশালী করিবার ইচ্ছায়ই বর্ত্তমান পুস্তকখানি প্রকাশ করিলাম। আমার এই প্রচেষ্টা কতখানি নূতনত্ব দিতে সমর্থ হইয়াছে ও পরিণত ছাত্রদের কতখানি সহায়তা করিতে পারিবে তাহা পাঠকের বিচার্য্য।

এই নাটকের ইতিহাস সঙ্কলন করিতে আমি সর্ব্বাপেক্ষা সহায়তা পাইয়াছি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত বিখ্যাত "নারায়ণ" পত্রিকা হইতে ও আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন স্বর্গত দেবেন্দ্র নাথ বসু রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' হইতে। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর কাগজপত্র হইতেও আমি যথেষ্ট সহায়তা পাইয়াছি।

১৯২৩।২৪ সালে স্বর্গীয় পীযুষকান্তি ঘোষের সহৃদয়তায় 'অমৃত বাজার পত্রিকা' আফিসে বসিয়া কাগজপত্র দেখিবার সুবিধা হইত বলিয়া উক্ত আফিসের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

রাজসাহী বরেন্দ্র লাইব্রেরী ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাদিও আমাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে প্রথম গিরিশচন্দ্র ঘোষ অধ্যাপকের গৌরবময় আসন দিয়া নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যে সুযোগ দিয়াছেন এই গ্রন্থ রচনার সে সুবিধাও কম নয়। তজ্জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। আমি যাহাদের নাম করিলাম তাঁহারা ব্যতীত এই গ্রন্থ রচনায় যাহারা সহায়তা করিয়াছেন সকলের নিকটই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

ভগবান অনুগ্রহ করিলে দ্বিতীয় খণ্ড বাহির করিবারও ইচ্ছা রহিল।

১২৪।৫বি রসারোড, কালীঘাট
কলিকাতা

একান্ত বিনীত
শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত

প্রথম অধ্যায়

বাঙ্গলা সাহিত্যের যেমন একটা প্রাচীন ইতিহাস আছে, বাঙ্গলা নাটকের সেরূপ নাই। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, মুকুন্দরাম, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কাশীরাম দাস বা কৃত্তিবাস ওঝার কৃপায় বহু শতাব্দি হইতে বাঙ্গলার গৃহে গৃহে কবিতার বাণী ঝঙ্কৃত হইত, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দির পূর্ব্বে বাঙ্গলা নাটক ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তবে কি বাঙ্গালী নাটক লিখিতে জানিতেন না? তা নয়, কিন্তু পূর্ব্বে নাটক লিখিত হইত সংস্কৃত ভাষায়। জয়দেবের মধুর সঙ্গীত "ধীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বরনারী" "দেহি পদপল্লব মুদারম্" প্রভৃতিই কেবল সর্ব্বত্র শ্রুত হইত না, শ্রীরাম চরিত্র অবলম্বন করিয়া "প্রসন্নরাঘব" নাটকও তিনি লিখিয়াছেন।

প্রায় সেই সময়ে ১২১১ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাধরের সন্তান মদন নামক জনৈক গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ যে "পারিজাত মঞ্জরী নাটিকা" রচনা করেন, তাহা গুজরাটের একটি প্রস্তর ফলকে লিপিবদ্ধ ছিল এবং পরে গত ১৯০৩ সালে আবিস্কৃত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের অনুপ্রেরণায় শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক উচ্চাঙ্গের রসাত্মক নাটক "বিদগ্ধ মাধব" ও "ললিত মাধব" রচিত হয়। পরমানন্দ সেনের "চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক", রায় রামানন্দের "জগন্নাথ বল্লভ" নাটক এবং গোবিন্দ দাস কবিরাজের 'সঙ্গীত মাধব' নাটকও কম উল্লেখনীয়

নয়। "সঙ্গীত মাধব" প্রভৃতি নাটকের বঙ্গানুবাদও হইয়াছিল বলিয়া নাটকের ইতিহাসে এইগুলিও স্থান পাইতে পারে। পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্কালে বিক্রমপুর রাজনগরে "রাজবিজয়" নাটক অভিনীত হইত। ভট্টনারায়ণের "বেণী-সংহার"ও পূর্ব্বোক্ত মদনের নাটিকার বহু পূর্ব্বে রচিত হয়।

শ্রীরূপ গোস্বামীর নাটক সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই বুঝিতে পারেন। কিন্তু উহার রস এত মাধুর্য্যপূর্ণ যে স্বয়ং রায় রামানন্দ বলিতেছেন—

এত শুনি রায় কহে প্রভুর চরণে।
রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্র বদনে॥
কবিত্বের না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার॥

কিন্তু চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক (দশ অঙ্ক বিশিষ্ট) অতি সহজ সংস্কৃতে রচিত। ইহার চরিত্র যেমন—বিবেক, ভক্তি, শ্রীবাস, শচী, অদ্বৈত, আর কেশব ভারতী ও নীলাচলে সার্ব্বভৌম, প্রতাপ রুদ্র প্রভৃতির সহিত প্রভুর লীলা। ইহার কথোপকথন, যেমন,—মৈত্রী প্রেমভক্তিকে বলিতেছে—

"কচিং" কোথায় গমন করিবেন ?

প্রেমভক্তি—"যে স্থানে বিশ্বহিতৈষী সেই বিশ্বম্ভর শ্রীরাধার ভাবে প্রভাবিত হইয়া মানবের অশেষ মঙ্গল বিস্তারের জন্য তাহার ন্যায় নৃত্য করিবেন, সেই স্থানেই গমন করিতেছি।

মৈত্রী—সোজ্জেব কোপদেসো ?

প্রেম—আচার্য্য রত্নস্য পুরাঙ্গনং

পরবর্ত্তী দৃশ্যে গৌরাঙ্গদেব শ্রীবাসকে কহিলেন· "শ্রীরাধাত্র স্বয়নিয়মহো নূনমাচার্য্যরত্ন শ্রীবাসস্যাঙ্গন ভুবি রসাত্মকমাভির্ভবিত্রী" অদ্য আচার্য্য রত্নের অঙ্গনে রসময়ী শ্রীরাধা স্বয়ং আভির্ভূত হইবেন।

নাটকের মধ্যে আবার একাঙ্ক ভাণের অভিনয়-কথাও আছে।

পরবর্ত্তী মিশ্র নাটকের উৎপত্তি এই সমস্ত সংস্কৃত নাটক হইতে। বস্তুতঃ সংস্কৃত নাটকের অপূর্ব্ব সম্পদই বাঙ্গালা নাটক রচনায় গভীর উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছে। প্রথমাবস্থায় সংস্কৃত নাটকই অনুদিত হইত। ক্রমে মৌলিক বাঙ্গলা নাটকের উদ্ভব হয়। "দেবভাষা পৃষ্ঠে যার, কিসের অভাব তার ?"—কবির বাণীই সার্থক হইয়াছে।

বাঙ্গলা নাটক রচনায় ইংরাজী নাটকের প্রভাবও আছে। বাঙ্গলা ভাষায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে কলিকাতার কয়েকটি থিয়েটার The Play House, Calcutta Theatre, মিসেস্ ব্রিষ্টোর থিয়েটার প্রভৃতি ইংরাজী নাট্যশালার অনুকরণে বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের গঠনের প্রয়াস উদ্রিক্ত হয়। সংস্কৃত নাটকের ঐতিহ্য এবং বঙ্গরঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনিয়তা মিটাইবার আকাঙ্ক্ষা—এই উভয়বিধ কারণে বাঙ্গলা নাটকের সৃষ্টি ও পুষ্টি হয়।* ✓

প্রথম বাঙ্গলা নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি দেবানন্দপুর-বাসী ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। "চণ্ডী"ই তাঁহার প্রথম প্রচেষ্টার সুফল। কিন্তু ইহা একখানি বিমিশ্র নাটক। ইহাতে বাঙ্গলার ভাগ খুবই কম। ইহার চরিত্রগুলি—চণ্ডী, মহিষাসুর, প্রজাগণ। প্রজারা কথা বলে বাঙ্গলা ভাষায়, কিন্তু তাহা অতি দুর্ব্বোধ্য ভাষা। সংস্কৃত, ফরাসী, প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষারও অবতারণা আছে। ভারতচন্দ্র ফারসী ভাষায়ও সুপণ্ডিত ছিলেন। সূত্রধার বলে সংস্কৃত ভাষায়, নটী বলে বাঙ্গলা ও প্রাকৃতে। সূত্রধারের স্তব—

* ভরতের নাট্যশাস্ত্র, কালিদাস, ভবভূতি, ভাস ও শূদ্রকের নাটকের পরিচয় ও ইংরাজী রঙ্গমঞ্চগুলির বিস্তারিত ইতিহাস মদ্প্রণীত Indian Stage Vol. Iএ পাইবেন।

"সা দুর্গা দশদিক্ষু
বঃ কলয়তু শ্রেয়াংসি
নঃ শ্রেয়সে—"

অতঃপর সূত্রধার "রাজ্ঞোহস্য প্রপিতামহো নরপতী রুদ্রোহ-ভবাদ্রাঘব" প্রভৃতি কথায় কৃষ্ণচন্দ্রের বংশপরিচয় ও ভারতচন্দ্রের প্রতি রাজানুগ্রহের পরিচয় দেন। নটী বলিতেছে বাঙ্গলা কথায়ঃ

"শুন শুন ঠাকুর, নৃত্য বিশারদ
সভাসদ সারী চতুরী।
নূতন নাটক নূতন কবিকৃত
হাম তোঁহি নূতন নারী॥"

চণ্ডীর প্রতি উল্লেখ করিয়া মহিষাসুর বলিতেছে—

"ভাগেগা দেবদেবী পাথর পাথর ইন্দ্রকো বাঁধ আগে।
নৈঋতকো রীত দেনা যমঘর যমকো আগকে অগলাগে।"

তৎপরে আবার মহিষাসুর প্রজাগণকে বলিতেছে—

"শোনরে গোঁয়ার লোগ, ছোড়দে উপাস যোগ,
মানহোঁ আনন্দ ভোগ ভৈঁষরাজ যোগমে।
আগমে লাগাও ঘীউ, কাহেকো জ্বালাও জীউ,
এক রোজ প্যার পিউ, ভোগ এহি লোগমে।
আপকো লাগাও ভোগ, কাম্‌কো জাগাও যোগ,
ছোড় দেও যাগ যোগ, মোক্ষ এহি লোগমে।
ক্যা এগান ক্যা বেগান, অর্থ নার আর জান,
এহি ধ্যান এহি জ্ঞান, আর সর্ব্ব রোগ মে॥"

তাহাতে চণ্ডীর ক্রোধ ও হাস্য-

"কমঠ করটট, ফণী ফণা ফলটট
দিগ্‌গজ উলটট ঝগটট ভ্যায়রে'।
বসুমতী কম্পত গিরিগণ নম্রত
জলনিধি কম্পত বাড়বময় রে।"

এই নাটকখানির অভিনয়ের প্রমাণ নাই, তবে এরূপ আরেকখানি বিমিশ্র নাটক "চিত্রযজ্ঞ" কৃষ্ণনগর মহারাজের বাড়ীতে ইংরাজী ১৭৭৭।৭৮ সালে অভিনীত হইয়াছিল। এখানিতে সংস্কৃত, বাঙ্গালা এবং প্রাকৃত সবভাষাই ছিল। পূর্ব্বোক্ত দুইখানি নাটকে বাঙ্গালাভাষার কিছু প্রয়োগ থাকিলেও উহাকে খাঁটি বাঙ্গালা নাটক বলা যায় না। শেষোক্ত নাটকখানি পণ্ডিত বিশ্বানাথ বাচস্পতি রচিত।

ইহার পরে ডিস্‌গাইস (Disguise) নামক একটী ইংরাজী নাটকের বঙ্গানুবাদ "ছদ্মবেশ" ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে লেবেডেফ নামে জনৈক রুষীয় ভাগ্যান্বেষী বাঙ্গালী গোলকনাথ দাশের সহায়তায় ২৫ নম্বর ডোমটুলীতে (কলিকাতা) অভিনয় করায়। নাটকখানি পাওয়ার কোন উপায় নাই। তবে বিদেশী লেবেডেফই বাঙ্গালীর মনে প্রথমে নাট্যকলা ও নাটকের উৎসাহ সঞ্চার করে। তখন মুদ্রাযন্ত্রের বিশেষ প্রসারও হয় নাই। "ছদ্মবেশে"র সঙ্গে "Love is the Best Doctor"এর অনুবাদও অভিনীত হয় বলিয়া অনুমান হয়।

ইহার পরে "কলিরাজার যাত্রা" নামে একখানি বাঙ্গালা নাটকের প্রমাণ ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে পাওয়া যায়। কোন কোন পাদ্‌রী কাগজ ইহাকে যাত্রার পর্য্যায়ে ফেলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু এখানি যে প্রকৃতই নাটক তাহা রাজা রামমোহন রায় সম্পাদিত "সম্বাদ কৌমুদিতে" প্রথমে প্রকাশিত হয়। "ক্যালকাটা রিভিউ'ও ইহাকে নাটকই বলিয়াছে। আর ১৮২২ সালের 'এসিয়াটিক জার্ণে'লও ইহাকে নাটক আখ্যা দিয়াছে এবং ইহার পরিচয় নিম্নলিখিত ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে :

"ইহাতে কুশীলব কয়েকজন আছে। নৃত্যগীতেরও ব্যবস্থা ছিল। রঙ্গমঞ্চে প্রথম আসে দুইজন বৈষ্ণব এবং কথোপকথনের সঙ্গে গান গায়। দ্বিতীয় দৃশ্যে আসেন কলিরাজ, তৃতীয়টিতে উজীর ও অন্যান্য লোক। চতুর্থটিতে গুরুদেব, পঞ্চম দৃশ্যে সুন্দর

পোষাক পরিহিত জনৈক ইংরাজ অপর একটী মেম সাহেবের সঙ্গে সদ্যঃই চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতা আসিয়াছেন। ষষ্ঠটিতে সাহেবের খান্‌সামা ও আয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছে—শেষ দৃশ্যে উপরোক্ত সকলেই একত্র হইয়া নৃত্যগীত এবং রং তামাসায় বাঙ্গালী দর্শকগণকে এমন তৃপ্তিদান করে যে অভিনয়ের জন্য ইহার বেশ সুযশ হয়।"১

এই নাটকখানির কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। তবে ১৮২২ সালে "কামরূপ যাত্রা নাটক"২ নামে আর একখানি নাটক ভবানীপুর শ্যামসুন্দর সরকারের বাড়ীতে অভিনীত হয়। সংস্কৃত প্রহসন "হাস্যার্ণব" ১৮২২ সালে কবি জগদীশ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন। ইহাতে লোভী রাজা, দুরাকাঙ্খী মন্ত্রী, নির্ব্বোধ চিকিৎসক ও ভীরু সেনানীর উল্লেখ আছে। "ধূর্ত্তনর্ত্তক" এবং "ধূর্ত্ত সমাগম" প্রভৃতিও [বিবিধার্থ সংগ্রহ, চৈত্র ১৭৮০ শক] সংস্কৃত হইতে বঙ্গভাষায় অনুদিত প্রহসন। এবম্বিধ প্রহসন কালুয়া ভুলুয়াদের দ্বারা রং ফলানো হওয়ায় শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করিত। এই সময়ে কয়েকখানি প্রহসন বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য সুপারিস হয় ৩।

১৮২২ সালে কৃষ্ণ মিশ্রের সংস্কৃত ষড়ঙ্ক নাটক "প্রবোধ চন্দ্রোদয়ের" বঙ্গানুবাদ "আত্মতত্ত্ব কৌমুদী" নামে প্রকাশিত হয়।

---

1. Asiatic Journal 1822

2 Comedy Comroopa Jatra was play d. Vide Calutta Journal Vol 11 No 7?. P P 309. 1822. March 29.

৩। সংবাদ কোমুদী ১৮২২ পঞ্চম সংখ্যা ও

Asiatic Journal Sept, 1822 "Lettar from a Correspondent pointing out the immoral and evil tendencies of dramas or plays recently invented and performed by a number of youngmen and roommending their suppression.

অনুবাদ করেন কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গদাধর ন্যায়রত্ন ও রামকিঙ্কর শিরোমণি। ইহার মূল্য ২৲ এবং সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। লণ্ডনের মিউজিয়ামে রক্ষিত পুস্তক তালিকা এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

ইহার পরে উল্লেখযোগ্য গোপীনাথ বিরচিত সংস্কৃত 'কৌতুক সর্ব্বস্ব নাটকের" বঙ্গানুবাদ। হরিনাভির রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ১৮২৮ সালে বাঙ্গালায় ইহা অনুবাদ করেন। ইহাতে কলিবৎস-রাজার উপাখ্যান আছে। ব্রাহ্মণদিগের বিদ্যানুশীলনে সহানুভূতি না দেখাইয়া আলস্যেই তিনি কাল কাটাইতেন। ইহা সাধুভাষায় লিখিত এবং ইহাতে পয়ার ও ত্রিপদীও ব্যবহৃত হইয়াছে [সমাচার চন্দ্রিকা ১৮৩১, মে]।

এই সমস্ত অনুদিত নাটকের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। যাহাহউক ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে শ্যামবাজারে নবীন কৃষ্ণ বসু মহাশয়ের বাড়ীতে যে প্রথম খাঁটি দেশীয় ভাবে অভিনয় হয়, ইহাতে কোন নাটকের অভিনয় হয় নাই। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর একজন পড়িত, আর অনুরূপ দৃশ্য-স্থলে অভিনেতাগণ যাতায়াত করিত।

প্রথম খাঁটি বাঙ্গালা নাটক রচিত হয় ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু ইহার পূর্ব্বেও কয়েকখানি অনুদিত সংস্কৃত নাটকের পরিচয় আবশ্যক। কালিদাসের শকুন্তলা অনুবাদ করেন রামতারক ভট্টাচার্য্য ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে, কাশ্মীর রাজ হর্ষবর্দ্ধনের রত্নাবলী করেন নীলমণি পাল ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে এবং মহানাটক করেন রামগতি ন্যায়রত্ন ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে। এই সব নাটকের বাঙ্গলা ভাষা দুর্ব্বোধ্য ছিল। "প্রেম নাটক" বা "রমণী নাটক," নাটক পদ বাচ্য হইলেও উহা প্রকৃতপক্ষে কবিতা পুস্তক মাত্র।

এই সময় যাত্রার বড়ই প্রভাব। যদি কখনও নাটক অভিনীত হইত, একদিকে সঙ্গীতের বাহুল্য, অন্যদিকে কালুয়া ভুলুয়ার

অনাবশ্যক উপদ্রব শিক্ষিত উন্নত মন শান্ত হইতে পারিত না। এই সময়কার নাটকের অবস্থা 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটক রচয়িতা তারাচরণ সিকদার উক্ত নাটকের ভূমিকায় (১৮৫২) নিম্নলিখিত ভাবে বিবৃত করিয়াছেন—

"এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েকগ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এ দেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদয় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনার্হ ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে। বোধহয় কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ। তন্নিমিত্ত মহাভারতীয় এই নাটক রচনা করিলাম।"

এ সময়ে 'বিদ্যাসুন্দরের' বড় প্রভাব। বিদ্যাসুন্দর যাত্রার পালায় এবং ঘৃণিত সঙ্গীতাদিতে, একসঙ্গে পিতাপুত্রের দেখা অসম্ভব হইত। কালীয় দমন, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রায় * ভক্তিরস প্রবাহিত হইলেও, যাত্রাদি বড় ঘৃণিত নিয়মে সম্পন্ন হইত (প্রভাকর, ১৮৪৮, ২৮ জুন) এদিকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে, উৎকৃষ্ট নাটকের প্রয়োজনিয়তা অনুভূত হইল। সেই সন্ধিক্ষণে তিনজন নাট্যকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন কীর্ত্তিবিলাসের যোগেন্দ্র গুপ্ত, দ্বিতীয় পূর্ব্বোক্ত তারা চরণ সিকদার ও তৃতীয় ভানুমতী চিত্তবিলাসের হুগলীর হরচন্দ্র ঘোষ। এ পর্য্যন্ত স্বর্গীয় সারদা চরণ মিত্র, শরচ্চন্দ্র ঘোষাল প্রমুখ মনীষীগণ 'ভদ্রার্জ্জুন'কেই প্রথম বাঙ্গালা নাটক বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু "কীর্ত্তিবিলাস" ইহার পূর্ব্বে রচিত ও প্রকাশিত

*যাত্রার বিস্তৃত ইতিহাস মদপ্রণীত ইণ্ডিয়ান ষ্টেজ Vol1 Chapt. VIII ও 'সাহিত্যের কথা'য় পাইবেন।

বলিয়া ইহার প্রথম-বাচ্য কীর্ত্তি কাড়িয়া লইয়াছে। "কীর্ত্তিবিলাস"ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রথম মৌলিক বাঙ্গলা নাটক। ইহা ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে রচিত। নাটকখানি পঞ্চাঙ্ক এবং ডবল ক্রাউনের ৭০ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। প্রথম অঙ্কে তুইটি অভিনয় দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে চারিটি, তৃতীয় অঙ্কে তুইটি, চতুর্থ অঙ্কে ৪টি এবং পঞ্চম অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য আছে। নাটকে নান্দী আছে, সূত্রধার ও নটীর কথাও আছে। নান্দীটি বড় সুন্দর—

"তাঁরে ভজ মন, করেন যে জন
সতত সৃজন পালন লয়।
ত্রিলোক কারণ, ত্রিলোকধারণ,
অনাদি নিধন করুণাময়॥"

ইহা প্রথম ট্রেজিডিও বটে। ইহার গল্পটি এইরূপ—"হেম-পুরাধিপতি রাজা চন্দ্রকান্ত পত্নী বিয়োগের পরে বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয়বার পরিণয়াবদ্ধ হন। তাহার প্রথম পক্ষের পুত্র কীর্ত্তিবিলাস ছিল নিস্পৃহ ও ধর্ম্মপরায়ণ। কিন্তু বিমাতা তাহার প্রতি প্রেম নিবেদন করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইলে রাজার নিকট সে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করে যে, যুবরাজ তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রেমবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছে। মূর্খরাজা যুবরাজের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন।" বিয়োগান্ত দৃশ্যে ইহার শেষ।

নাটকে বিন্দুমাত্র অশ্লীলতা নাই। ইহাতে অনেক তত্ত্ব-কথার অবতারণা হইয়াছে। কিন্তু ভাষায় সাগরী যুগের প্রভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যেমন—

"এই ক্ষণভঙ্গুর অকিঞ্চিৎকর সংসার-মত্ততায় যথার্থ আত্মবিস্মৃত হইয়া মিথ্যা কালহরণ করিতেছি।"

"লম্পট ভ্রষ্ট ব্যক্তিরা বারাঙ্গনালয়ে গমন করিয়া আমোদ প্রমোদে মত্ত আছে।"

"জগদীশ্বর, যেমন তৃষিত কুরঙ্গ বারি-আকাঙ্ক্ষায় ব্যগ্র হইয়া নদীতীরে ধাবমান হয়, আমার প্রাণ তেমনি তোমার করুণাসাগরে গমন কারণে অস্থির হইয়াছে।" *

"প্রতিবিম্ব সমান ধন-যৌবন ম্লান" "আত্মার ধ্বংস ধূলামরা সবারই সমান," "অঙ্গার শতধৌতেন মলিনত্ব ন মুঞ্চতি"—ইত্যাদি।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে কীর্ত্তিবিলাসের বন্ধু মেঘনাথ উন্নত চরিত্র, আর রাজপারিষদ প্রাণনাথের পাপের পরিণাম প্রদর্শিত হইয়াছে।

রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ বলেন "The drama shows considerable talont." কিন্তু তাঁহার লিখিত উক্তি—কীর্ত্তিবিলাস যমুনায় আত্মহত্যা করিয়াছে, নাটকে সেরূপ পাওয়া যায় না। এই নাটক 'পুরণ ভকতের' অনুরূপ। ডক্টর সুকুমার সেন যে বলেন "কীর্ত্তি বিলাসের ভূমিকা হ্যামলেটের অনুরূপ"—ইহা আদৌ ঠিক নহে। পরবর্ত্তী "পূর্ণচন্দ্র" নাটকের সহিত ইহার সৌদৃশ্য আছে। নাটকে খুব সামান্য কবিতা আছে, অধিকাংশ বিষয়ই গদ্যে লিখিত। রাজমহিষী কীর্ত্তিবিলাসের স্ত্রী সৌদামিনীকে বলিতেছে—

"নারী হ'য়ে নারীনিন্দা করে যেইজন।
না জানি যাতনা কত পাবে প্রতিক্ষণ॥"

সৌদামিনী—"কি নিমিত্ত ঠাকরুণ মিছা দ্বন্দ্ব কর।
রাজার ঘরণী তুমি আমি-ত অপর॥"

দ্বিতীয় নাটক হিন্দু-স্কুলের গণিত-শিক্ষক তারাচরণের "ভদ্রার্জ্জুন" নাটক কীর্ত্তিবিলাসের অব্যবহিত পরেই রচিত (১৮৫২)।

* প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় ১৮৫১ সালের উল্লেখ আছে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ২৮ মে "সংবাদ প্রভাকরে"ও এই নাটকের উল্লেখ আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এপর্য্যন্ত ভদ্রার্জ্জুন যে প্রথম নাটক বলিয়া সাধারণে বিদিত ছিল, কীর্ত্তিবিলাস উহার সে কীর্ত্তি কাড়িয়া লইয়াছে। তবে নূতন পন্থাগ্রহণে ভদ্রার্জ্জুনই যে প্রথম পথ-প্রদর্শক, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলার পরবর্ত্তী নাট্যকারগণও অজ্ঞাতসারে কি জ্ঞাতসারে অতঃপরে তাঁহার প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করিয়াছেন।

তারাচরণ সংস্কৃত নাটক রচনার পদ্ধতি বর্জ্জন বরিয়াছেন। ইহাতে সূত্রধার, নট বা নটীর অবতারণা হয় নাই। কোনরূপ প্রস্তাবনা বা পরিশিষ্টও নাই। বিদূষক চরিত্রের সমাবেশও হয় নাই। বস্তুতঃ ইহা সংস্কৃত নাটকের প্রভাব-মুক্ত। এই বিষয়ে তারাচরণ মধুসূদনেরও অগ্রবর্ত্তী।

'ভদ্রার্জ্জুন' নাটকের ভাষা বড় সহজ। বিন্দুমাত্র সাগরী প্রভাব ইহাতে নাই। যেমন—

রোহিণী—বরটি নাকি বড় ভাল

দেবকী—কে বল দেখি ?

রোহিণী—রাজা দুর্য্যোধন

দেবকী—আমি শুনিয়াছি, তাহার নাকি বড় দুষ্ট চরিত্র।

রোহিণী—বিলক্ষণ, সে কি কথা ? এমন হবেনা—

দেবকী—আবার তাহার বাবা কাণা

রোহিণী—তার বাপ অন্ধ তাতে দোষ কি ? সে ত কাণা নয়।

দেবকী—ওমা সে কি ? একে দুর্য্যোধনকে সকলে কাণারাজার বেটা বলে, আবার সুভদ্রাকে কি কাণার বৌ, কাণার বৌ বলিয়া ডাকিবে ? ওমা সেটা বড় লজ্জার কথা।

স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলালের" বহুপূর্ব্বে রচিত বলিয়া শীকদার আরও প্রশংসা লাভের যোগ্য। কিন্তু কথাগুলি সুন্দর ও প্রাঞ্জল হইলেও, নাটকে বিস্তর পয়ার ও ত্রিপদী কবিতা

ব্যবহৃত হইয়াছে, আর নাটকের একতৃতীয়াংশই কবিতাতে ভরা। বস্তুতঃ ভদ্রার্জ্জুনকে পূর্ণাঙ্গ নাটক বলা যায়না। ইংরাজী নাটকের প্রস্তাবনা (Prologue) এর ন্যায় ভদ্রার্জ্জুন নাটকের পূর্ব্বে একটী 'আভাস' প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে নাটক এবং নাট্যকলার যশোবাদ করিয়া নাট্যকার লিখিয়াছেন—

"সকল কাব্যের মধ্যে নাটক প্রধান
সর্ব্বস্থলে নাটকের আদর সমান।
সভ্য কি অসভ্য জাতি পৃথিবী নিবাসী
এ রস দর্শনে হয় সবে অভিলাষী ॥"

অতঃপরে নাটকের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। এই আভাসের পরেই প্রকৃত প্রস্তাবে নাটক আরম্ভ হইয়াছে। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রা হরণই নাটকের বিষয়।

নাটকে ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত (Action) নাই। বলদেবের অভিমান, ভীমের ক্রোধ, নারদের কলহপরায়ণতা প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্রোপদী চরিত্র আদৌ ফুটে নাই। সত্যভামা এবং রুক্মিণীর মধ্যে কোন স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয় না। কথাগুলিতে সামান্য গ্রাম্যতা দোষ উপেক্ষনীয়। বিবাহ-আচার প্রভৃতি ও কথাবার্ত্তা যেন বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে হইতেছে মনে হয়। তথাপি নাটকখানি নূতন ধরণের এবং সহজ ও সরল বলিয়া ঐতিহাসিকের চক্ষে ইহার মূল্য খুবই বেশী। নাটকে অশ্লীলতা নাই, তবে হাস্যরস জমে নাই। ভদ্রার্জ্জুন নাটকের অভিনয় হয় নাই।

কৃষ্ণের প্রতি বলদেবের অভিমান সুন্দর হইয়াছে—

"কৃষ্ণ সহোদর ভিন্ন আমি নাহি জানি অন্য
কৃষ্ণের তেমন মন নয়।
কৃষ্ণের সাহস পায়, অর্জ্জুন হরিল তায়
সতত কৃষ্ণের এই ধারা ॥"

পরে দেবকী, রোহিণী প্রভৃতি সকলের প্রতি রাগ করিয়া বলেন—

"এখন দুঃখের পাশে, কি করিব গৃহবাসে
লোকালয়ে না রহিব আর।
ছাড়ি সবে মম আশ, সুখে কর গৃহবাস
সব আশা ঘুচেছে আমার ॥"

এই খেদোক্তিতেই নাটকের শেষ হইয়াছে।

("ভানুমতী চিত্তবিলাসের" নাট্যকার হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের (১৮১৭-১৮৮৪) উদ্যমও বিশেষ প্রশংসনীয়। কিন্তু এই নাটক সেক্সপিয়রের 'মার্চেন্ট অব্ ভেনিস' অবলম্বনে রচিত। তবে একথা ঠিক যে পাশ্চাত্য গল্পাশ্রয় করিয়া লিখিত হইলেও ইহার ভারতীয় রূপ প্রশংসার্হ। চরিত্রগুলিও ভারতীয় নামই ধারণ করিয়া পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহা ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত হয় এবং আদৃত হওয়ায় উৎসাহ পাইয়া হরচন্দ্র দ্বিতীয় নাটক "কৌরব বিয়োগ নাটক" প্রণয়ন (১৮৫৮) করেন।

হরচন্দ্রের তৃতীয় নাটক 'চারুমুখ চিত্তহরা'—রোমিও জুলিয়েটের অনুবাদ (১৮৬৪ সালে রচিত) তাঁহার চতুর্থ নাটক 'রজতগিরি নন্দিনী' নাটক ১০৭৪ সালে প্রকাশিত হয়।)

যাহা হউক সেই যুগের উল্লেখযোগ্য এবং যুগান্তকারী নাটকই "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব নাটক"। এই নাটকের সমালোচনা কালে ভদ্রার্জ্জুন প্রভৃতি তৎকালীন নাটকের পরিচয় স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে (৩য় খণ্ড) দিয়াছেন :—

"পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় কয়েকখানি নাটক প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা যথার্থ নাটক নহে। তাহাতে অনেক পদ্যাদি আছে এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ সমীচীন ও সুসম্পন্ন এবং সুপাঠ্য বটে, কিন্তু সাহিত্যিকেরা যাদৃশ গুণপ্রযুক্ত নাটককে দৃশ্যকাব্য বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহার অত্যল্প মাত্র তাহাতে বর্ত্তমান দেখা যায়।"

সাহিত্যিকের বিচারে যাহা দৃশ্যকাব্য পদবাচ্য, তাহারই আদি নাটক, রামনারায়ণ তর্করত্নের "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব নাটক"। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ১৮২২ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের নাট্যকার রবার্টসন তাঁহার সমসাময়িক। তাঁহার Society এবং Caste সুগঠিত নাট্যমঞ্চ সহায়ে ইংলণ্ডে ভাবী আন্দোলনের সূত্রপাত করে বটে, কিন্তু কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব সামাজিক ব্যাপারে মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত অভিনেতার সাহায্যে বাঙ্গালা দেশে এমন আন্দোলন সৃষ্টি করে যে, কৌলীন্য প্রথার মূলে কুঠারাঘাত হয়। ঐ সময়ে বল্লালী কৌলীন্য ধারা এমন জঘন্য প্রথায় পরিণত হয় যে, একই লগ্নে ৮, ১০, ১০, ২৫, ৩৫, ৫০, ৭০ বয়স্ক বহু কুমারী কন্যা মুমূর্ষ বৃদ্ধের সহিত পরিণীতা হইত, এবং তাহাতেই নাকি কুলরক্ষা পাইত। বৈদিক তর্করত্ন* রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের এই কুপ্রথা সম্বন্ধে এই নাটক রচনা করেন।

---

* তর্করত্নের জন্ম চব্বিশ পরগণার হরিনাভি গ্রামে ১৮২২ সনে। নানা চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ কাব্য, স্মৃতি এবং ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠার্থ প্রবেশ করেন এবং জ্যেষ্ঠ উক্ত কলেজের অধ্যাপক প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের বাসায় বাস করেন। ১৮৫৩খ্রী: তিনি সিঁদুরিয়া পটিস্থ গোপাল মল্লিকের প্রাসাদস্থিত মেট্রোপলিটন কলেজের প্রধানপণ্ডিত নিযুক্ত হন এবং ঐ বৎসরেই 'পতিব্রতোপাখ্যান' এবং ১৮৫৪ খ্রী: কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব নাটক রচনা করেন। ১৮৫৫ খ্রী: জ্যেষ্ঠসহোদরের পরলোক গমনের পর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৮৮৩ সনে অবসর গ্রহণ করেন। তাহার পরে স্বগ্রামে বাস করিয়া হরিসভা প্রতিষ্ঠা ও চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। বেণী-সংহার, রত্নাবলী, শকুন্তলা, নবনাটক, মালতীমাধব, রুক্মিণী হরণ, স্বপ্নধন, ধর্ম্মবিজয়, কংসবধ প্রভৃতি তাঁহার বিশিষ্ট রচনা। যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, উভয় সঙ্কট, চক্ষুদান প্রহসনও বেশ শিক্ষাপ্রদ। ১৮৭৩ সনে তিনি 'আর্য্যশতক', ও ১৮৮১-৮২ সনে দক্ষযজ্ঞ (পূর্ব্বার্দ্ধম ও উত্তরার্দ্ধম) রচনা করেন। উভয় গ্রন্থই কবি চূড়ামণি কালিদাসের রচিত বলিয়া ভ্রম হয়। দক্ষযজ্ঞ প্রণয়ন করিবার পরে ইংলণ্ডীয়

তিনি যখন পূর্ব্ববাঙ্গলায় এক চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করেন, সেই বাটিতে কামিনী নাম্নী একটী রূপবতী কুলীন কন্যা ছিল। তাহার স্বামী অনেকগুলি বিবাহ করে। একদিন শ্বশুর বাড়ী আসিয়া রাত্রিতে স্ত্রীকে শয়ান অবস্থায় দেখিয়া কর্কশস্বরে তাহাকে বলে "আমায় অর্থদ্বারা পূজা না করিয়া শয়ন করিয়া আছিস? আমি কত বড় কুলীনের ছেলে জানিস্? আগে আমার মর্য্যাদার টাকা আন্, পরে নিদ্রা যাস্।" কামিনী উত্তর করে "আমার তো কিছুই নাই, তুমি আমাকে টাকা না দিলে আমি টাকা কোথায় পাইব?" ইহাতে স্বামী আরও উত্তেজিত হইয়া বলে "কি আবার তর্ক? আমার যেখানে পূজা নাই, সেখানে আমি একবিন্দু কাল থাকি না" বলিয়া চলিয়া যায়। ইহার পরে সে আর শ্বশুর বাড়ী আসে নাই। ইহার কিছুদিন পরে কামিনী উদ্বন্ধনে নিজের জীবনলীলা সাঙ্গ করে।

এই বেদনাদায়ক দুর্ঘটনা তর্করত্ন মহাশয়ের হৃদয়ে এমন গভীর রেখাপাত করে যে, 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব' নাটক এই অনুভূতিরই ফল! নাটকের কুলকুমারীতে এই কামিনীর অনেকটা ছায়াপাত হইয়াছে। কুলকুমারীর স্বামী বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছে। সে তাহাকে তুষ্ট করিবার জন্য কাট্‌না কাটা টাকা নিয়া আসিল। কিন্তু আরও টাকা চাওয়ায় সে উত্তর করে—"নাথ, পত্নীর নিকট হইতে কেন পতি অর্থ নিবে?" ইহাতে সে রাগত হইয়া চলিয়া যায়—

পণ্ডিত মহাত্মা ই,বি, কাউএল তাঁহাকে "কবিশেখর কবিনাং মধ্য চূড়ামণি স্বরূপ" উপাধিদান করিয়া পত্র লেখেন। অধ্যক্ষ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বলেন, "সংস্কৃত শ্লোক নাটকে রচনা করাতে তিনি যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা প্রায় দেখা যায় না। কুলীনকুলসর্ব্বস্বে অনেক সুন্দর pun আছে। সভায় তাঁহার মধুর ও সু-রসগত উপদেশ বাণী এবং বক্তৃতা শুনিবার জন্য সকলেই সমবেত হইতেন। ১৮৮৬ সনে তিনি উদরীরোগে ছয় মাস ভুগিয়া পরলোক গমন করেন।

"নারী হ'য়ে মোরে তুমি দেও উপদেশ
তখনি চলিয়া গেল ক'রে অতি রোষ।"

ফুলকুমারী যশোদার নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে—

"ঠান্‌দিদি, এ থাকার চেয়ে না থাকা ভাল, না থাক্‌লে মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়। এ থেকে নেই, একি সামান্য দুঃখু।" অপর একটী রমণী চন্দ্রমুখীও আক্ষেপ করিতেছে—

"আসিবেক করি আশ, তাহার বিবাহ চাষ
মাস মাস ফেরে নানা দেশ,
ব্যবহার দিতে নারি, তাই মোরে বিভা করি
স্বপনেও না করে উদ্দেশ।"*

নাটকের আখ্যান খুব সংক্ষিপ্ত। কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় চারিটি অনূঢ়া কন্যাকে কুলীনের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য এক ঘটককে নিয়োজিত করেন। কন্যাগণের বয়স যথাক্রমে ৩২, ২৬, ১৫, ও ৮। ঘটক একদিনের চেষ্টায় এক জীর্ণশীর্ণ কলেবর বৃদ্ধকে পাত্র রূপে লইয়া আসেন। তাহার অবস্থা এই—

"তামাক টানিয়া মরে কাশিতে কাশিতে
বোধ হয় হয় গয়া এবার কাশিতে।"

নাটকের ছয়টি অঙ্ক। প্রথম অঙ্কে কুলপালক পাত্রের জন্য কিরূপ ব্যগ্র হইয়াছেন আর কৌলীন্য প্রথার প্রতি কটাক্ষ আছে। তিনি একজন ঘটক নিয়োজিত করেন ও এই বিষয়ে প্রতিবেশী কুলধনের সহিত আলাপ হয়।

* ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে' এইরূপ কথা আছে—

"দু চারি বৎসরে যদি আসে একবার
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যাভার
সুতা বেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়
তবে মিষ্টমুখ নাহি রুষ্ট হয়ে যায়।"

দ্বিতীয় অঙ্কে ঘটক অনৃতাচার্য্য এক বৃদ্ধ বর স্থির করিয়া পরদিন বিবাহ সম্পন্ন করিবার দিন স্থির করেন। সেই দিনটি ছিল খুবই অশুভ, কিন্তু ঘটকের চক্রান্তে শুভ বলিয়া স্থির হয়। তৃতীয় অঙ্কে কুলপালকের ব্রাহ্মণী ভাবী জামাতার সম্বন্ধে আকাশ-কুসুম রচনা করিতেছেন, মেয়েদিগকে সান্ত্বনা দিতেছেন, প্রতিবেশিনী-গণকে জলসেতে পাঠাইতেছেন। চতুর্থ অঙ্কে কুলীনগণের গুণ-ব্যাখ্যা হইতেছে। পঞ্চম অঙ্কে দুইটী স্ত্রীলোক মাধবী ও মহিলা নিজেদের দুঃখদুর্দ্দশার কথা আলাপ করিতেছেন ও উদরপরায়ণ ব্রাহ্মণ ফলারের স্বপ্ন দেখিতেছেন। ষষ্ঠ অঙ্কে বরের স্বাস্থ্য, বয়স ও চেহারা সম্বন্ধে পুরোহিত ধর্ম্মশীল এবং ঘটক অনৃতাচার্য্যের কথোপকথন। ঘটক গুণ ব্যাখ্যা করিতেছে এবং দ্বিগুণ দক্ষিণার লোভ দেখাইয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লইতেছে। অতঃপরে কন্যা সমর্পণের সঙ্গে সঙ্গেই নাটকের শেষ হয়।

তর্করত্ন সংস্কৃত রীত্যনুসারে নাটক রচনার প্রয়াস পান। এবং ইহাতে সংস্কৃত নাটক ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই নাটক কৌলীন্য প্রথার উচ্ছেদ সাধন-উদ্দেশ্যে রচিত। মহামতি বল্লালসেন কর্ত্তৃক কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় গুণানুসারে। ব্রাহ্মণগণ সেই সময় হইতেই কুলীন, শ্রোত্রীয়, গৌণ কুলীন ও বংশজ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। কুলীনের কন্যার অন্য তিন শ্রেণীর কাহারও সহিত বিবাহ হইলেই কুলক্ষয় হইত। ইহার দশ বৎসর পরে দেবীবর ঘটক কুলীনদিগকে আবার মেলবন্ধ করেন। যেমন, ফুলিয়া, খড়দহ মেল ইত্যাদি—

কালক্রমে কৌলীন্য প্রথা কিরূপ ভীষণাকারে পরিণত হয়, এই নাটকে তাহার বিস্তৃত পরিচয় আছে। এমনও অনেক সময় হইয়াছে যে অশীতিবর্ষ বৃদ্ধ একই লগ্নে পনেরো, পঁচিশ—সময় সময় একশতটী—দশ হইতে আরম্ভ করিয়া ষাট বৎসরের—কুমারীর

পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, আর স্বল্পকাল মধ্যেই তাহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তিতে সকলকেই বৈধব্য দশায় পরিণত হইতে হইয়াছে। এই কুপ্রথায় নানাপ্রকার দুর্নীতি ও কুরীতি বাঙ্গলা দেশের সমাজে প্রবেশ করিয়া ইহাকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় রামনারায়ণ তর্করত্নও এই সংস্কার সাধনে বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। "পতিব্রতোপাখ্যানে" যাহা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হয়, "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্বে" তাহা সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তী 'নীলদর্পণ' নাটকের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক বলিয়া সকলেই উহার নাম করে। আর সামাজিক অবস্থার এত দ্রুত পরিবর্ত্তন হয় যে তখনকার অবস্থা আজকাল কাহারও কল্পনায়ই আসেনা বলিয়া এখন আর কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব নাটকের তেমন গৌরব নাই।* কিন্তু সে সময়ে ইহাও সামাজিক বিষয়ে "নীলদর্পণ" নাটকের পথপ্রদর্শকই ছিল।

এই নাটক নূতনবাজার, বাঁশতলা ও চুঁচুড়ায় অভিনীত হয়। আর তর্করত্ন মহাশয়ের অসাধারণ সাহস ছিল। এমনও সময় গিয়াছে, অভিনয়ান্তে কুলীনগণ সর্ব্বসমক্ষে নিজেদের যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া অভিসম্পাত দিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কখনও তাঁহার দেহের উপর আক্রমণাশঙ্কাও গিয়াছে। তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। স্বর্গীয় রমেশ দত্ত, সি, আই, ই, মহাশয় যথার্থই বলেন—

"Akshoy Kumar had educated his countrymen in advanced ideas and the great Vidyasagore had espoused the cause of female education and was even then meditating his memorable attack on the cruel system of enforced widow-hood. It was at such a time in 1854, that the first original dramatic

* শরৎবাবুর 'বামুনের মেয়ে'তে কৌলীন্য প্রথার উল্লেখ আছে।

composition Kulin-Kula-Sarvaswa held up the custom of Kulinisim and polygamy to deserved redicule and contempt." —"*Literature of Bengal.*"

নাটকখানি কমিডি ও খুব সরস ভাবে রচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক অবস্থা এই নাটকে বেশ দেদীপ্যমান। কি রকম বয়সের বরের সহিত কুলপালকের কন্যাদের সম্বন্ধ হইয়াছে, সে বিষয়ে প্রতিবেশিনী চপলা সুলোচনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—

"বর নাকি বাহাত্তুরে বুড়ো ?"

সুলোচনা—এতো ভাল, আমার বরের কথা শোন্—

"বয়স খতালে পর নাড়ি ভেবে এসে জ্বর
কোল শোভা হ'য়ে রাত কাটে
এ পতি মাথার চূড়া, বুড়োতো রসের গুঁড়া
কাছে থাকে তবু শোভা হয়।
সে যে অতি শিশু ছেলে, কেঁদে উঠে ভয় পেলে
শান্ত ক'রে রাখি তবে রয়।"

যমুনার আইবুড়ো অবস্থায়ই জীবন যৌবন অতীত হইয়াছে। সে রাগিয়া বলিতেছে—

"বয়স হইল ষাট, বিবাহের নাই পাট,*
আছে কাট শেষের উপায়"

* ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে'ও আছে—
"আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে,
বদিবা হইল বিয়া কিছু দিন বই
বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই ॥"

আর যশোদা বলিতেছে—

"ভগিনী আমার ছয়, আমারে নে সাত হয়,
সবার বিবাহ হয় এক দিনে।"

আর তার বয়স—পাহাড় পর্ব্বতের সমান। কিরূপে বিবাহ হয়, তাহাও সে বলিতেছে—

"উহার চরম-কালে বন্ধুরা না ফেলে খালে
গঙ্গাতীরে আনিল সত্বরে,
পাইয়া সুযোগ্য ঘর, বরি মোরা সেই বর,
অতঃপর সে পায় পঞ্চত্ব"

আর আমরা—'তখনি বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হই সপ্তস্বসা।'

এদিকে হেমলতা একেবারে দৃঢ়পণ করিতেছে—

"—বিয়ার নাহি প্রসঙ্গ, অনঙ্গেতে জ্বরেগো অঙ্গ
রঙ্গ দেখে লোকে ব্যঙ্গ করে
মনেতে ভেবেছি সার, সুধিব বল্লালি ধার,
কুলে জলাঞ্জলি দিয়া পরে—"

এই সব দুঃখের কথাই গ্রন্থকার সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় আজন্ম রসিক ছিলেন। যৌবনে ছাতুবাবু (স্বর্গীয় ধনকুবের আশুতোষ দেব) তাহার জ্যেষ্ঠকে পণ্ডিত বলিয়া ৩৲ বিদায় ও তিনি ছাত্র বলিয়া দুই টাকা বিদায় দিলে, তিনি বলেন "বাবু, আপনি ওর উপর নেত্রপাত ক'রে আমার উপর পক্ষপাত ক'রলেন।" ছাতুবাবু অর্থ বুঝিতে পারিয়া ৩৲ টাকা বিদায় দেন। অমনি তিনি বলিয়া উঠেন 'এতো আশুতোষের নেত্রপাত হ'লো না।' আশুতোষ পঞ্চমুখ মহেশ্বরের অপর নাম। অমনি ১৫৲ দেওয়া হইল। এইরূপ রসিকতা নাটকের ছত্রে ছত্রে। কুলীন

অধর্ম্মরুচি ও তাহার পিতা বিবাহবণিকের কথোপকথনের কথা বলিতেছি। উভয়েরই বিবাহ-ব্যবসা। এতদিন সাক্ষাৎ অথবা পরিচয় ছিলনা। এখন খুঁজিয়া খুঁজিয়া পিতা বিবাহ বণিকের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহার কাছে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, তাহার নকুলপুরের সম্বন্ধী অনুরোধ জানাইয়া চিঠি লিখিয়াছে যে তাহার একটা মেয়ে হইয়াছে, সে যেন অবশ্য সেখানে যায়—'

বিবাহ বণিক (পিতা)—যাও অন্নপ্রাসন দাও গে—

অধর্ম্ম—কি বল্‌বো, বাবা, লজ্জা হয়, সে দেশে প্রায় তিন বছর যাই নাই, তাই বলি—মেয়েটা হ'লো।

পিতা—(উচ্চহাস্য করিয়া) বাপু হে তাতে ক্ষতি কি—আমি তোমার জননীকে বিবাহ করিয়া তথায় একবারও যাই নাই, একেবারে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তা বাপু আমরা কুলীনের ছেলে আমাদের এ রকম হয়ে থাকে, তাতে ক্ষতি কি ?

ইহার পরে যখন বিমলাপুর গ্রামে গিয়া যৌবনদশাপ্রাপ্ত উত্তম মুখোপাধ্যায় নামক পুত্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন নিজে নিজেই বলিয়া উঠিলেন—

"কৈ অধর্ম্মরুচি বাপা এখন কোথায়—কন্যা হ'য়েছে ব'লে বড় ভয় পেয়েছিলেন, দেখুন এসে, আমার এককালে কুড়ি বৎসরের ছেলে হয়েছে।"

কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব নাটকে ভোজনপটু বৈদিক ব্রাহ্মণ উদার-পরায়ণের ফলারের স্তুতিটিতে যেমন রসসৃষ্টি হইয়াছে, রসনাও তেমনি সিক্ত হইয়া উঠে। তখনকার দিনে যুবকগণ কবিতাটি একরকম মুখস্থ করিয়াই রাখিত। ইহা এই—

"ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি
দুচারি আদার কুচি,
কচুরী তাহাতে খান দুই,

ছোঁকা আর শাকভাজা,
মতিচুর, বোঁদে, খাজা
ফলারের যোগাড় বড়ই
নিখুঁতি, জিলিপি, গজা,
শুনে শক্ শক্ করে নোলা,
হরেক রকম মণ্ডা
যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা
যত খাই তত হয় তোলা।
খুরি, খুরি ক্ষীর তায়,
চাহিলে অধিক পায়,
কাতারি কাটিয়া শুখো দই,
অনন্তর বাম হাতে,
দক্ষিণা পানের সাথে,
উত্তম ফলার তাকে কই।”

অন্যান্য ব্রাহ্মণ—এতো হ'ল উত্তম ফলার। মধ্যম ফলার কিরূপ?—

উদরপরায়ণ— "সরু চিঁড়ে শুকো দই
মর্ত্তমান ফাঁকা খই
খাসা মণ্ডা পাত পোরা হয়,
বৈদিক ব্রাহ্মণ তবে
মধ্যম ফলার করে,
দক্ষিণাটা ইহাতেও রয়”—

অন্যান্য ব্রাহ্মণ—মধ্যমও মন্দ নয়। অধম ফলারটি কিরূপ?

"গুমো চিঁড়ে, জলো দই,
তেতো গুড়, ধেনো খই,
পেট ভরা যদি নাহি হয়,

রন্দ্ধ্রেতে মাথা কাটে,
হাত দিয়ে পাতা চাটে,
অধম ফলার তারে কয়।"

প্রায় একশত বৎসর অতীত হইল, তর্করত্ন মহাশয় এইভাবে ফলারের শ্রেণী বিভাগ করেন, কিন্তু গ্রাম-দেশে এই পাশ্চাত্য সভ্যতার দিনেও কি এই শ্রেণীবিভাগ ঠিক তেমন ভাবেই জনগণের মধ্যে চলিতেছে না?

রহস্যপ্রিয় ঘটক অনৃতাচার্য্যও 'কুলীনের লক্ষণ' সম্বন্ধে পরিচয় দিতেছে—

"দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে, নিবাস শ্বশুর ঘরে
মাদকেতে আমোদ বিস্তর
সন্ধ্যার নাহিক গন্ধ গায়ত্রীর আটক্যবন্ধ
সদানন্দ পূর্ণ কলেবর।"

নাটকে সেকালের স্ত্রীলোকের গাত্রালঙ্কারের পরিচয় পাওয়া যায়—কুলপালকের কন্যাগণের বিবাহ উপলক্ষে প্রতিবেশিনী মহিলারা যে নানাবিধ অলঙ্কার পরিয়া যাইতেছেন, সে পরিচয় রসিকা নাপতিনি নিম্নলিখিত ভাবে প্রদান করিতেছে—

'কর্ণমূলে পরিল সুবর্ণ কানবালা'

কেহ কেয়াপাত, কেহ চৌদানি পরিয়া যাইতেছে, কিন্তু ইহার আমদানি নূতন। আবার কাহারও—

"শ্রবণ যুগলে দোলে কাহার কুণ্ডল"

কাহারও ভালে স্বর্ণ-সিঁতি, কাহারও নাকে মুক্তা ফল, কাহারও হাতে সোণার বালা, আর কেহ বা—

"বাহুতে ধারণ করে কেহ বা কেয়ুর"

কাহারও কণ্ঠে ডায়মন কাটা চিক, কাহারও গলায় "মণিময় হার",

আর—

"কেহ যত্ন ক'রে পরে রত্নের আঙ্গুরী"

আর— "কোন নারী নিতম্বে ধরিল চন্দ্রহার
বিরহী যুবার মন করিতে সংহার"

কাহারও—

'চরণে রজত নির্ম্মিত ঢেউ তরঙ্গের মল'

আর কেহবা—

"খোঁপার মাঝে গুঁজিয়া গোলাপ
কোকিল কুজিত কণ্ঠে করিছে আলাপ।

নাটকে পণ্ডিতদের বিদ্যার সম্বন্ধেও কটাক্ষ আছে—

"জানকীর কথা শুনে হাসে দুর্য্যোধন
দ্রৌপদী কান্দিয়া বলে বাছা হনুমান।"

কাহারও জ্ঞান সম্বন্ধে আরোপ হইয়াছে—

"শ্রীমন্ত করিয়া কোলে বেহুলা নাচনী
বিবাহের মন্ত্রে বলি তপ্তা বৈতরণী"।

এখন 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব নাটক' নাটক কিনা এ বিষয়ে বিচার্য্য। কেহ কেহ ইহাকে নাটক পদবাচ্য বলিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র "বিবিধার্থ সংগ্রহে" পুস্তকে বলেন—

"দেশীয় নিন্দিত প্রথার উৎসেদের নিমিত্ত প্রাচীন পণ্ডিতেরা সর্ব্বদাই রূপক রচনা করিতেন। 'ধূর্ত্ত নর্ত্তক', 'কৌতূক সর্ব্বস্ব,' 'হাস্যার্ণব', এইরূপই রূপক রচনা। সাহিত্যকারদের মতে এবম্প্রকার রচনার নাম 'প্রহসন'। কিন্তু প্রহসনে দুইটী অঙ্ক থাকে। কিন্তু তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ইহাকে ষড়ঙ্ক সম্পন্ন নাটকরূপে প্রচারিত করেন। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় সাহিত্যালঙ্কার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং

কাব্য রচনায় তৎপর। তিনি সমীচীন যত্নে এই নাটকখানি রচনা করিয়াছেন…পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন, তাঁহার প্রযত্ন ব্যর্থ হয় নাই।"

অধ্যক্ষ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন ইহাকে "খুব ভাল ভাল ইংরাজী Comedy অপেক্ষা কোনও অংশে ইহা মন্দ নহে।"*

কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব নাটকের বৈশিষ্ট্য যে, ইহা সম্পূর্ণ মৌলিক নাটক —কোনরূপ সংস্কৃতের অনুবাদ নয়। ইংরাজী কোন বিষয়ের ছায়াও ইহাতে নাই, এমন কি দেশীয় পুরাণ বা ইতিহাস হইতেও ইহার মূল সংগৃহীত হয় নাই। দেশের সামাজিক অবস্থা ইহাতে সম্যক্ প্রকটিত হইয়াছে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :

"তিনিই প্রথমে দেখাইলেন যে যদি সাহিত্যের দ্বারা দেশকে উন্নত করা যায়, তবে বাঙ্গলা দেশের কথা লইয়া সাহিত্য গড়িতে হইবে। আর সাহিত্যের উপাদান আমাদের ঘরেই আছে। তাহার জন্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হইবে না।"

রামনারায়ণও প্যারীচাঁদের সমকালবর্ত্তী। তাঁহার "পতিব্রতোপ-খ্যানের" সময় প্যারীচাঁদ আসরে নামেন নাই। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালের' ন্যায় এই নাটকেও সম্পূর্ণ দেশীয় ধারাই দেদীপ্যমান।

সংস্কৃত প্রথামত নাটকে নান্দী, সূত্রধার ও নটী তিনই আছে। নাটকে সরস কবিতার বড় ছড়াছড়ি। মাঝে মাঝে বিরক্তিকর। স্থানে স্থানে সরল ভাষা, আবার কোন কোন স্থলে মৃত্যুঞ্জয়ী ভাষাও আছে। যেমন কুলপালক বলিতেছে—

"সহস্র-কিরণ সূর্য্য প্রচুর কিরণ প্রদানে আপনার সহস্র নামই কি সার্থক করিতে উদ্যত হইয়াছেন ? এক্ষণে অনবরত পথ পরিশ্রান্ত

* পুরাতন প্রসঙ্গ। পৃষ্ঠা ৯৫

ও দিনকর কিরণে নিতান্ত ক্লান্ত পান্থলোকেরা সন্তাপশান্তি নিমিত্ত ছায়াপ্রধান পাদপতলে পল্লবশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাভজনা করিতেছে। মহীরুহচয় একান্ত পবনপত্যবিরহে সজ্জন মানসের ন্যায় চাপল্য পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে, বরাহগণ পল্লবপঙ্কে সর্ব্বাঙ্গ বিলীন করিয়া রহিয়াছে, কুরবীকুল তরুমূলে শয়ন করিয়া অমীলিত নয়নে রোমন্থ করিতেছে।"

নাটকের আখ্যানবস্তু কিছুই নয়। নাটকে প্লট নাই। কোন চরিত্রের বিকাশও হয় নাই। কেবল নাটকের ছলে সামাজিক অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ইহা নাটক পদবাচ্য। আর এই মৌলিক কমিডি খানিই পাকা হাতে পড়িয়া ক্রমে 'বলিদান', 'শাস্তি কি শান্তি' প্রভৃতি মর্ম্মন্তুদ বিয়োগান্ত সামাজিক নাটকে পরিণত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা অন্যান্য সামাজিক নাটকের পথ প্রদর্শক। এই নাটকখানি লিখিয়া রামনারায়ণ রংপুরের জমিদার কালীচন্দ্র চৌধুরীর নিকট ৫০৲ পুরস্কার ও মুদ্রাঙ্কন ব্যয় ৫০৲ পান। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইহা রচিত হয়। রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা ইহার ঐতিহ্য ও গৌরব যে ইহাই **প্রথমাভিনীত বাঙ্গলা নাটক**। প্রথমে ইহার অভিনয় হয় ১৮৫৬ খৃঃ।*

আর ইহার অভিনয়ের পরেই দেশীয় অভিনয়ের দ্বার খুলিয়া

---

* ডক্টর সুকুমার সেনের উক্তি—"কুলীন কুলসর্ব্বস্ব শকুন্তলা নাটকের পরে ১৮৫৭ সালে অভিনীত হয়," নিতান্তই ভ্রমাত্মক ও অসার। স্বর্গীয় গৌরদাস বসাক, রমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী এবং উভয় থিয়েটারের অভিনেতা মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা দ্রষ্টব্য। ভারতীয় নাট্যমঞ্চে বিস্তারিত আলোচনা প্রথম খণ্ড পৃঃ ১৪ ও ১৫. পুরাতন প্রসঙ্গ পৃঃ ১৫০ বিপিন গুপ্ত—এবং Indian Stage Vol II Pp. 28—36

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই, বলেন "At the request of Jatindra Mohon Tagore, Kulin Kula Sarvasva was acted in 1856." ......Sakuntala was staged after that. Literature of Bengal, Page 184.

গেল। তৎপরে ১৮৫৭ খৃঃ ছাতু বাবুর বাড়ীতে শকুন্তলা ও কালী-প্রসন্ন সিংহের বাড়ীতে "বেণী সংহার নাটক" অভিনীত হয়।

যুবকদের উপরে এই নাটকের প্রভাব কিরূপ হয়, সে সম্বন্ধে স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় "পিতা পুত্র" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :

"নাটকের নটীর গান হাটে, বাজারে গীত হইতে লাগিল, নান্দী, নাপ্‌তে বৌর পরিচয়, ফলারের লক্ষণ মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলাম—এখনও ভুলি নাই।"

নাটকে অন্যান্য সামাজিক বিষয়েরও অবতারণা হইয়াছে। ফুল কুমারী বিধবা ঠানদিদিকে বলিতেছে—

"ও পাড়ায় শুন্‌লেম, রাঁড়ের বে নাকি চল্‌তি হবে, তবেই ত তোর হ'লো।"

যশোদা—(সবিষাদে) আর ভাই, হবে হবেই শুন্‌চি, হয় কৈ, আমি থাক্‌তে আর হবে ? আমার তেমন অদৃষ্ট নয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ আন্দোলন এই সময়ে যে উপস্থিত হইয়াছিল, নাটকে তাহারও কতকটা আভাস পাই।

সে সময়ে কন্যা বিক্রয়েরও প্রথা ছিল। গর্ভবতী স্ত্রী স্বামী কর্তৃক বর্জ্জন আশঙ্কা করিয়া স্বস্তয়ন করিতে চায়, কেননা স্বামী বলিতেছে—"এবার যদি না মেয়ে হয়, দূর ক'রে দিব।"

স্ত্রী শিক্ষার সম্বন্ধে নাট্যকার তর্কবাগীশের মুখে আরোপ করিয়াছেন—"বর্ত্তমান কালে স্ত্রীজাতির বিদ্যা শিক্ষার সম্যক্ প্রথা নাই ; সুতরাং তাহারা অন্তঃকরণকে বিষয় বিশেষে ব্যবহৃত করিতে পায় না !"

রচনা দুই এক স্থানে বড় সুন্দর ! যদিও ব্রাহ্মণী "অপক্ক নিদ্রা কষায়িত লোচন উভয় করে মার্জ্জন করিতে করিতে" মেয়ে দিগের

* শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত 'রামতনু লাহিড়ী ও বঙ্গ সমাজ'।

সহিত কথা বার্ত্তা বলিতেছেন। তথাপি জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রৌঢ়া শাম্ভবী বেশ "সভ্রুব ভঙ্গে" বলিতেছে—

"যেমন মোল্লা বলে 'হেঁদুর পরব নাই', তেমনি বল্লাল বলেন "কুলীন বামনের মেয়ের কপালে বে নাই।"

ব্রাহ্মণী—বাছা, এখন কি বল্লাল আছে! সে যে অনেক দিন মরেছে—

শাম্ভবী—সে ম'লে কি হবে মা! তার চেয়ে তার চেলা বড়, তারা মেল্লা বেড়াচ্ছে দেখিস্—

ব্রাহ্মণী—তাদের ভয় কি মা! আমি কুল রক্ষা করবো, কুলীন বর এসেছে—

শাম্ভবী—(সবিষাদে)—ওমা, তুই কি কুল রক্ষা করবি, তবে জাতি রক্ষা কে করবে মা?

ব্রাহ্মণী— আজ তোদের বে হবে।

কিশোরী—(সবিস্ময়ে) বে কাকে বলে মা!

ব্রাহ্মণী—তা জানিস্নে প্রধান সংস্কার!

কিশোরী—ওমা! তাকি আমি খাব?

(কিশোরীর বয়স আট বৎসর মাত্র)

বর সম্বন্ধে পুরোহিত ধর্ম্মশীল ও ঘটক অনৃতাচার্য্যের কথোপকথনও বড় কৌতুকপ্রদ! যেমন—

ধর্ম্মশীল—দেখিতে সুন্দর বর দাদ সব গায়।

অনৃতাচার্য্য—বিনা চক্রে শালগ্রাম শোভা নাহি পায়॥

ধর্ম্মশীল—দেখিতেছি কিছু কিছু আছে জল দোষ।

অনৃতাচার্য্য—এ দোষ ইহার নয় এযে জল দোষ॥

ধর্ম্মশীল—উভয় চরণ যেন মুকি ভরা গুল।

অনৃতাচার্য্য—দেখ দেখি কিবা শোভে দেখিতে এ গুলগুলি

ধর্ম্মশীল—বসন্ত রোগের চিহ্ন মুখেতে কিরূপ।

অনৃতাচার্য্য—শীতলার অনুগ্রহ নহে অপরূপ ॥

ধর্ম্মশীল—দক্ষিণ নয়ন কেন দেখিতে না পাই।

অনৃতাচার্য্য—যে বলে উহাকে কাণা তার চক্ষু নাই ॥

ধর্ম্মশীল—কুলের পতাকা রবে এ কর্ম্ম করিয়া।

অনৃতাচার্য্য—দক্ষিণা দ্বিগুণ পাবে শীঘ্র দাও বিয়া ॥

নাটকের সম্বন্ধে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র আরও বলিয়াছেন "বঙ্গভাষায় যে সকল রূপক প্রকটিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব নাটকই রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইবার যোগ্য।"

অধ্যক্ষ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন—"কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" নাটকে একটী শ্লোক আছে (৬ষ্ঠ অঙ্ক) যাহা মাঘ কবি লিখিলেও অগৌরব হইত না। কবিতাটি এই :—

"অতিরিক্তবপুঃ স্খলদ্গতি
বসুহীনো বিগতাম্বরো রবিঃ।
পততি প্রতিবারি বারুণী
বহুসেবাফলমেতদেবহি ॥"

এই শ্লোকটীর মধ্যে যে pun রহিয়াছে তাহা কেমন সুন্দর! এক অর্থ—সূর্য্যদেব অত্যন্ত লাল হয়ে মন্দগতি, কিরণ সব মিলিয়ে যাচ্ছে এমন অবস্থায় সমস্ত আকাশ অতিক্রম করে জলে ঝাঁপ দিচ্ছেন, পশ্চিম দিকে যাওয়ার এই ফল। অন্য অর্থ—মদ খেয়ে মাতালের শরীর লাল হয়ে উঠেছে, সে চলতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছে, সব টাকা উড়িয়ে দিয়েছে, গায়ের কাপড় গা থেকে খসে পড়েছে, সে জলে ঝাঁপ দিচ্ছে। অত্যন্ত মদ খাওয়ার ফল এই।

আমরা এখানে আরও একটী শ্লোক পাঠকবর্গকে উপহার দিব। ইহাও এইরূপ দ্বর্থ-বোধক—

"অয়মেতি বিস্তৃত করঃ পুরতো
দ্বিজরাজ ইত্যভভয়াৎ কৃপণঃ

বিরলী বভূব রবিরাত্মবসু
র্নহি যাচকেঽভিমুখা সুলভা।"

বঙ্গানুবাদ—

"দ্বিজরাজ (১) সমায়াত কর (২) প্রসারিয়া,
দেখি বসু (৩) নিয়া রবি গেল পলাইয়া। *
একথা যথার্থ বটে নাহিক সংশয়
কৃপণ যাচকে দেখি সঙ্কুচিত হয়।"

উভয় শ্লোকই বিরহীপঞ্চাননের মুখে আরোপিত হইয়াছে।

কবি-শ্রেষ্ঠ জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' নাট্যকারের অতিশয় প্রিয় কাব্য ছিল। এই নাটকে নটীর গানে—

"চুত মুকুল কুঞ্জ অঞ্চলদলি কুল
গুণ গুণ রঞ্জন গানে
মদকল কোকিল, কলরব সঙ্কুল
রঞ্জিত বাদল তানে
রতিপতি নর্ত্তন বিরস বিকর্ত্তন
শুভ ঋতুরাজ সমাজে
নব নব কুসুমিত বিপিন সুবাসিত
ধীর সমীর বিরাজে।"

গানটিতে কবি জয়দেবকেই মনে পড়িতেছে। এই গানটিই সর্ব্বত্র তখন শোনা যাইত, অক্ষয় সরকার মহাশয় ইতিপূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

সেকালে নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের এত সুখ্যাতি ছিল যে, ৺কালী প্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার ও বেলগাছিয়া থিয়েটারের উদ্বোধন হয় তাহার নাটক লইয়াই—। "রত্নাবলী"র

* (১) চন্দ্র ও কিরণ (২) কিরণ ও হস্ত (৩) কিরণ ও ধন

অভিনয় শিক্ষিত সমাজের বিশেষ আদরণীয় হইয়াছিল। মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটা থিয়েটারও প্রধানতঃ তাহার নাটক আশ্রয় করিয়াই বহুদিন পর্য্যন্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের মধ্যে নাট্যরস বিতরণ করিতে সমর্থ হয়।

কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব যখন রচিত হয় (১৮৫৪) তখনও বঙ্কিমচন্দ্র গদ্য লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। দীনবন্ধু বা মধুসূদনের উল্লেখযোগ্য কিছু বাহির হয় নাই। টেকচাঁদের আলালও ইহার ৩।৪ বৎসর পরে পুস্তকাকারে বাহির হয়। সুতরাং তর্করত্ন মহাশয়ের কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব কেবল নাটকের হিসাবে নয়, সংশোধিত বাঙ্গলা ভাষারও প্রথম উদ্যমের নিদর্শন। পরবর্ত্তী লেখকগণের অনেক নাটকের সঙ্গে তুলনা করিলে ইহার স্থান উচ্চদিকে না হইলেও, প্রথম উদ্যম বরাবরই প্রশংসনীয়। বস্তুতঃ সামাজিক বিষয়ের সংস্কার সাধন করিতে পণ্ডিত রামনারায়ণই বঙ্গীয় লেখক কুলের অগ্রবর্ত্তী (pioneer) ছিলেন।

তবে কি কারণে যে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ও মহাকবি গিরিশচন্দ্র যথাক্রমে সাহিত্য ও নাটকের সম্রাট হইয়াও রামনারায়ণ সম্বন্ধে কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়াও আমি খুঁজিয়া পাই নাই।

যাহা হউক, কয়েক বৎসর পরে ১৮৬৬ সালে যে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে (প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ী) থিয়েটার খোলা হয়, তাঁহারই "নবনাটক" লইয়া। বস্তুতঃ সেই সময়কার প্রথম ও প্রধান নাট্যকার বলিয়াই তাহার নাম ছিল "নাটুকে রাম-নারায়ণ"।

রামনারায়ণের সংস্কৃত ভাষা হইতে অনুদিত বেণীসংহার, মালতীমাধব প্রভৃতি অন্যান্য নাটকের পরিচয়ের আবশ্যক নাই। তবে 'নবনাটক' সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করিব। ইহাতে বহুবিবাহের

দোষ দেখানো হইয়াছে। ইহা কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব নাটকের বার বৎসর পরে (১৮৬৬ সালে) রচিত। ইতিমধ্যে মধুসূদন ও দীনবন্ধু নাটক রচনায় অসামান্য প্রতিষ্ঠার্জ্জন করিয়াছেন। তাই নবনাটকে পূর্ব্বগামীগণের প্রভাব অনেক স্থানে প্রকটিত দেখিতে পাই। তথাপি নবনাটকেও রামনারায়ণ বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। নবনাটক সম্বন্ধে নান্দীর পরেই নটী সূত্রধারকে অন্যান্য নাটক সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছে—

"এ নব নাটুকে দেশে নব নাটকের অপ্রতুল কি? কত চটকওয়ালা নাটক এখন দিন দিন হয়ে উঠচে দেখ্‌চোনা?"—

বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় এই নাটক খানি বেশ সমাদৃত হয়। নাটক খানি বিয়োগান্ত—বোধহয় মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী এবং দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের অনুকরণে। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে কোন বিয়োগান্ত নাটক নাই। তর্করত্ন মহাশয় বোধহয় ইংরাজী শিক্ষিত লোকদের রুচির প্রশ্রয় দিতে বিয়োগান্ত নাটক খানি রচনা করেন।

তর্করত্ন মহাশয় নবনাটক সম্বন্ধে নিজে লিখিয়াছেন—"নব-নাটক ১২৭৩ সালে রচিত হয়। ইহাতে কলিকাতা জোড়াসাঁকো বাসী বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৲ পারিতোষিক দেন। এই নাটক তাঁহার বাড়ীতে নয় বার অভিনয় হয়।" নাটকের বিজ্ঞাপনেও লিখিয়াছেন "আমি জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রণয়ন করিয়াছি। পুস্তক খানিও তিনি গুণেন্দ্র নাথকে উৎসর্গ করেন। এই নাটকেও ছয়টী অঙ্ক।

এই পুস্তকে ঈশ্বরগুপ্ত, দীনবন্ধু এবং মধুসূদন তিন জনেরই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দীনবন্ধুর নীলদর্পণের উক্তি—

"বাড়া ভাতে ছাই তব বাড়া ভাতে ছাই"
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই।"

নবনাটকের সাবিত্রী প্রতিধ্বনি করিতেছে—

"কি বলিব দিদি মোর কপালের গুণ।
দেখ কপালের গুণলো কপালের গুণ" ॥

এবং শেষ দৃশ্যও প্রায় নীল দর্পণের শেষ দৃশ্যের অনুরূপ। তবে দীনবন্ধুর নিমচাঁদকে ব্যঙ্গ করিবারই জন্য বোধ হয়, অথবা তৎকালীন ইংরাজী নবীশদের ঠাট্টা করিয়া একজনের মুখে আরোপ করা হইয়াছে—

'আমি থিঙ্ক্ করি, তাঁর সে ডেঞ্জার এখনো হ্যাং কচ্চে'।

বহু বিবাহের দোষ লিখিয়াও বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে তিনি ভুলেন নাই। একস্থানে লিখিতেছেন—

"বিধু এই ফাল্গুণ মাসে রাঁড় হয়েছিল, এরমধ্যে সেদিন তার বিয়ে হয়ে গেল।"

উত্তরে—হবেনা কেন? ওদের যে বাড়ি ভাল।

ভাষার সম্বন্ধে কিছু বলিবনা। কারণ 'কুলীন কুল সর্ব্বস্ব' হইতে এই ১২ বৎসরে অসংখ্য সাহিত্য পুস্তক রচিত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট রচনার সঙ্গে তুলনা করিবার ইহাতে বিশেষ কিছু নাই।

শেষ দৃশ্যে মনেহয় দীনবন্ধুর রচনাটি আরও উৎকৃষ্ট।

"নীলদর্পণের" উন্মাদ দশাগ্রস্তা সাবিত্রীর মন্ত্রপাঠ—

"সাপের ফেনা বাঘের নাক।
ধুলোর আগুন চড়োক পাক ॥
সাত সতীনের সাদা চুল।
ভাটির পাতা ধুতরো ফুল ॥
নীলের বিচি মরিচ পোড়া।
মড়ার মাথা মাদার গোড়া ॥
হস্নে-কুকুর চোরের চণ্ডী।
যমের দাঁতে এই গণ্ডী ॥"

প্রতিধ্বনিত দেখিতে পাই এইনাটকে দ্বিতীয়া স্ত্রী চন্দ্রলেখাকে রসময়ী গোয়ালিনীর তন্ত্রমন্ত্র শিক্ষাদানে—

"বেতের মাথার ঘিয়ে
প্রদীপ তাহে জ্বালিয়ে
মড়ার মাথার খুলি
তাহে কাজল তুলি
ত্রিমাত্রা পথের ধূলি
নৌকার জলে গুলি
পানের শিকর পেলে
নখে তা ছিঁড়িয়ে তুলে
কনক ধুতার ফুল
হিরাকশি শতমূল
গোময়ের ঠুলি করে্য
পুড়িয়ে করিয়ে ছাই
তাই আমি যা মনে করি তাই পাই—"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহার স্মৃতি কথায় বলেন—

"অভিনয়ান্তে পণ্ডিত মহাশয় বলিয়া উঠেন—"যা—রা, পলাট নাই পলাট নাই (plot) বলে, এখানে এসে একবার দেখে যাক্"—

তৎকালীন নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্মৃতিকথাটী ভারী চিত্তাকর্ষক ও বিবরণ ঘটিত বলিয়াই পাঠককে সেইটি উপহার দিলাম।

যাহা হউক কুলীন কুল সর্ব্বস্ব নাটকে অনেকগুলি ছড়া আছে, যেমন—

"যার বে তার মনে নাই, পাড়া পড়শীর ঘুম নাই!"

"গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি—"

"হস্তীর কাঁধে এসে যায়, হাম্মা দেখে ভয় পায় !"
"যদি পাই রূপার কুচি, তবে মুচিকেও করি শুচি।"
"আম ফুরালে আম্‌সী, যৌবন ফুরালে কাঁদে বসি।"
"পঞ্চগোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, ইহা ছাড়া বামুন নাই।"
"দুষ্ট গরু থাকার চেয়ে শূন্য গোল ভাল।"
"না পেতে নাজ্জামাই ভাতার।"

পরবর্ত্তী অনেক নাট্যকার এরূপ ছড়া ব্যবহার করিয়াছেন।

আর একখানি নাটক এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুপ্রসিদ্ধ কবি ও সাংবাদিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "বোধেন্দু বিকাশ নাটক" সুধী সমাজ কর্ত্তৃক বিশেষ আদৃত হয়। ইহা কৃষ্ণ মিশ্রের সংস্কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকালম্বনে লিখিত হইলেও, ঠিক অনুবাদ নয়। ইহার চরিত্রাদি যেমন মদন, রতি, বিবেক, মতি, বিদ্যা, উপনিষদ ইত্যাদি। নাটকের অনেকাংশ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কবি সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকরে বাহির হয়। নাটকখানি কবি শেষ করিতে পারেন নাই, এবং তাহার পরলোকপ্রাপ্তির পরে তাঁহার সহোদর রাম চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে বাহির করেন।*

নাটকের আখ্যান এই—বিবেকের দুই পত্নী ছিল। উপনিষদ দেবী ও মতি। বিবেক মতির সহিত অধিক কাল থাকিত, ইহাতে উপনিষদ্ দেবী বিবাগিনীর ন্যায় অবস্থান করেন। অতঃপরে বিবেক মতিকে বলেন—"যদি তুমি ক্ষণকাল বিষয় বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থান করো, তবে আমার প্রবোধ নামক পুত্র হইবে।" উপনিষদের গর্ভে বিদ্যা কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া মায়া কল্পিত

* Vide Indian Stage Vol. II Enlarged edition, pp 21,22.

জগৎ ধ্বংস করেন। ইহার অর্থ এই বিবেকের সহিত উপনিষদের সংস্রবে যে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তাহাতেই পুরুষ জীবন্মুক্ত হন।

'বেঙ্গল হরকরার' মতে নাটকখানি সুলিখিত বটে, কিন্তু ধর্ম্মের কঠিন বিষয় আলোচনায় সাধারণের মনোরঞ্জন হওয়া সম্ভব নয়। নাটকাভিনয়ের প্রমাণ নাই।

বোধেন্দু বিকাশ ও কুলীন কুল সর্ব্বস্ব নাটকের পরে নন্দকুমার রায় অনুদিত (১৮৫৫) শকুন্তলা উল্লেখযোগ্য! ইতিপূর্ব্বেও 'শকুন্তলার' অনুবাদ হইয়াছিল বলিয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে ১৮৫৭ সালে ছাতুবাবুর বাড়ীতে ইহার অভিনয় হইয়াছিল।

কালীপ্রসন্ন সিংহের নাটক

নাটকের ইতিহাসে 'বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটারে'ও বেশ অবদান আছে। রামনারায়ণ অনুদিত ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার এবং প্রতিষ্ঠাতা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বিক্রমোর্ব্বশী, সাবিত্রী সত্যবান ও মালতী মাধব ১৮৫৭ হইতে ১৮৫৯ পর্য্যন্ত এখানে অভিনীত হয়।

বিক্রমোর্ব্বশী মহাকবি কালিদাসের প্রসিদ্ধ নাটক রচিত ও স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক অনুদিত হয়। চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরূরবা কেশীদৈত্যের হাত হইতে উর্ব্বশীকে রক্ষা করিয়া তাহার প্রতি অনুরাগী হন। উর্ব্বশীও তাহার বীরত্ব ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে হৃদয় মন সমর্পণ করে। কিন্তু রাজবয়স্য মাণবকের নির্ব্বুদ্ধিতায় এই প্রণয় কাহিনীর কথা মহিষী ঔশীনরীর কাণে উঠিয়া তাহাকে ঈর্ষাপরবশ করে। এদিকে উর্ব্বশী ইন্দ্র সভায় "লক্ষ্মী সয়ম্বর নাটক" অভিনয় কালে পুরুষোত্তমের পরিবর্ত্তে পুরূরবার নাম করিয়া স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসিত হয়। পুরূরবা ও উর্ব্বশীর মিলনে উর্ব্বশীর প্রতি অর্পিত শাপ, বরে পরিণত হয়।

"বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটারে" অভিনয় কালে (১৮৫৭ সেপ্টেম্বর) কালীপ্রসন্নই পুরূরবার ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত সমসাময়িক বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ প্রকাশ করে :—

"প্রশংসিত বাবুর বয়ঃক্রম ১৭ বৎসরের অধিক হইবেক না। ঐ কালমধ্যে নানাগ্রন্থ সাময়িক পত্র ও বক্তৃতা রচনা করিয়া স্বদেশীয়-দিগের নিকট প্রশংসা পত্র হইয়াছেন।...পূর্ব্বে প্রস্তাবিত গ্রন্থের কিয়দংশ "পূর্ণোচন্দ্রদয়" পত্রে প্রকটিত হইয়াছিল।"

বস্তুতঃ কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে কবি কালিদাসের কথায় আমরা বলিতে পারি—

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বম্
ন চাপি কাব্যং নবমিতবদ্যম্।
ইতি "মালবিকাগ্নি মিত্রম্"
"পুরাতন হইলেই সাধু নাহি হয়।
নূতন বলিয়া কাব্য নিন্দনীয় নয়।"

'মালতীমাধব' ভবভূতির উক্ত নামধেয় নাটকের কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ। কিন্তু রচনায় যথেষ্ট মৌলিকতা আছে এবং অনেক সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত সংযোজিত হইয়াছে।

'কুলীন কুল সর্ব্বস্ব' নাটকের ন্যায় এই সময় বিধবা বিবাহ, প্রসঙ্গে রচিত আরও দুইখানি সামাজিক নাটকের উল্লেখ একান্ত প্রয়োজন। ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহের আন্দোলন উঠে। বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' নামে একটি প্রবন্ধ লেখায় এই আন্দোলন আরম্ভ হয়। সেই ১৮৫৬ সালেই দুইখানি নাটকে এই আন্দোলন সমর্থন করা হয়- একখানি উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবা বিবাহ নাটক, আর একখানি উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিধবোদ্বাহ' নাটক। প্রথমখানি দুইতিন বৎসর পরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তস্য ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন,

নরেন্দ্রনাথ সেন (ইণ্ডিয়ান মীরার সম্পাদক), প্রভৃতির যত্নে অভিনীত হয়। নাটকে আছে—

বৃদ্ধ কীর্ত্তিরাম ঘোষের বালবিধবা কন্যা সুলোচনা প্রতিবেশী রামকান্তের পুত্র মন্মথকে ভাল বাসিয়াছিল। ক্রমে সে পাপ-পঙ্কে পতিত হয়, এবং পরে নিজের কলঙ্ক কাহিনী প্রকাশ করিয়া আত্মহত্যা করে। দেশাচারের ফলে হিন্দু নারীকে যে চিরবৈধব্য ভোগ করিয়া অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, ঐ নাটকে সেই চিত্রটি বর্ণিত আছে। সুখময়ী কীর্ত্তিরামের বিধবা পুত্র-বধূ, পদ্মাবতী তাহার ভার্য্যা। একস্থানে সুলোচনা পদ্মাবতীকে বলিতেছে—

"বাবা যেমন পাঁচটার পর তোকে বে করেছে, আবার তুই যদি আজ মরিস, তবে অমনি আর একটী হবে। আমাদের বেলাই (অস্পষ্ট স্বরে) যত........."*

শ্যামাচরণ মিত্র বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে যুক্তি দেয়। অন্যান্য চরিত্র রামদাস বাবাজি (বৈষ্ণব), অদ্বৈত দত্ত পড়সী, মোহিনী ঐ স্ত্রী, শ্যামা ঐ অবিবাহিতা কন্যা ও প্রসন্ন জেষ্ঠা বিধবা কন্যা, কৃষ্ণসখা ঐ পুরোহিত রামদেব ভট্টাচার্য্য অধ্যাপক, গণক, রসবতী নাপ্তিনি ইত্যাদি।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"সংস্কৃত নাটকাদিতে নান্দীপাঠ ইত্যাদি যে সকল প্রাচীন প্রণালী আছে তাহা বঙ্গভাষায় সুশ্রাব্য হয়না, এজন্য পরিত্যাগ করিলাম।"

নাটকের অভিনয় হয় মেট্রোপালিটান কলেজে ১৮৫৯ সালে। প্রতাপ মজুমদার (পরে রেভারেণ্ড) হন মন্মথ, নরেন্দ্রনাথ সেন

* নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই তারিখ ২৫ ভাদ্র, ১২৬৪, ভবানীপুর। প্রথম মুদ্রণ হয় এক বৎসর পূর্ব্বে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে।

সুখময়ী, কৃষ্ণবিহারী সেন রামকান্ত ও পরবর্ত্তী বেঙ্গল থিয়েটারের সুদক্ষ ম্যানেজার বেহারীলাল চট্টোপাধ্যায় সুলোচনা, অক্ষয় মজুমদার রামদেব।

এই নাটকেও কয়েটি ছড়া আছে যেমন যত হাসি, তত কান্না, ঠক বাছতে গা ও জোর, যার বে তার মনে নাই, পাড়া পড়শীর ঘুম নাই।

'সাবিত্রী সত্যবান' সেক্সপিয়রের নাটকের ন্যায় পঞ্চাঙ্ক। রঙ্গমঞ্চে অভিনীত পঞ্চাঙ্ক নাটক 'সাবিত্রী সত্যবানই প্রথম। অতঃপরে মধুসূদন হইতে আরম্ভ করিয়া সব নাট্যকারই ইংরাজী প্রথানুসারে নাটক পঞ্চাঙ্ক করিয়াছেন। সাবিত্রী যে যমের হাত হইতে স্বামীকে বাঁচাইতে পারিয়াছিলেন, মহাভারতীয় এই উপাখ্যান অবলম্বনে নাটক খানি রচিত। চরিত্রসৃষ্টি তেমন সরস হয় নাই।

বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটারের জন্য 'বাবু' নামে একখানি প্রহসনও পুনর্ব্বার রচিত হয়। অভিনয়ের কোন প্রমাণ নাই। প্রহসনখানি দেখিনাই বলিয়া সমালোচনায় বিরত হইলাম।

এইখানে আর একখানি নাটক উল্লেখযোগ্য। প্রথমাভিনীত "কুলীন কুল সর্ব্বস্ব" নাটকের কুলপালক ভূমিকার অভিনেতা মহেন্দ্র লাল মুখোপাধ্যায় চৌদ্দ বৎসর বয়সে (১৮৫৭ খৃঃ) "চার এয়ারের তীর্থযাত্রা" নাটক রচনা করেন। অধ্যক্ষ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন "মহেন্দ্র আমার বাল্যবন্ধু। তিনি যে বাঙ্গালা stageএর ইতিহাস দিয়াছেন এমনটি আর কেহ দিতে পারিবে না। মহেন্দ্র একটী genius."*

নাটকে চারটি অঙ্ক, কোন দৃশ্য নাই। পানোন্মত্ত যুবকের পরিণাম বর্ণিত হইয়াছে। প্রহসন জাতীয় সাধারণ নাটক মাত্র।

* পুরাতন প্রসঙ্গ, ১৫৯ পৃঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মধুসূদন দত্ত

রামনারায়ণের পরের নাট্যকারই মাইকেল মধুসূদন দত্ত। "কুলীন কুল সর্ব্বস্ব" হইতে মধুসূদনের প্রথম নাটক শর্ম্মিষ্ঠায় অনেক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। মধুসূদনের জীবনই একখানি বৃহদায়তন জীবন্ত নাটক। নিজে বড়লোকের ছেলে ও অদ্ভুত প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি হইয়াও, ভাগ্যদোষে আজীবন তাহাকে দারিদ্র্যের দুঃসহ কষ্টভোগ করিতে হয়। তাঁহার জীবনও যেমন নানারূপে ভাগ্য বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত, মৃত্যুও আবার সেইরূপ বিয়োগান্ত নাটকের এক মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য।

মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, কাপ্টেন ডি, এল, রিচার্ডসন সেখানে ইংরাজীভাষার অধ্যাপক ছিলেন। কাপ্তেন সাহেব সেক্সপিয়র এত ভাল আবৃত্তি করিতে পারিতেন যে লর্ড মেকলেও আনন্দের সহিত বলিতেন "ভারতবর্ষ সম্বন্ধে হয়ত আমি সবই ভুলিয়া যাইতে পারি, কিন্তু আপনার সেক্সপিয়র পড়ার কথা আমার হৃদয়ে চিরাঙ্কিত থাকিবে। "I can forget every thing of India, but not of your reading Shakespeare."

রিচার্ডসন সাহেব ছাত্রগণকে থিয়েটার দেখিতে উৎসাহ দিতেন। চৌরঙ্গী ও সাঁসুচি থিয়েটারের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি থিয়েটারের টিকেট আনাইয়া ছাত্রগণকে দিতেন ও থিয়েটার যাইতে অনুরোধ করিতেন। চৌরঙ্গী ও সাঁসুচি থিয়েটারের অভিনয় দেখিয়া বাঙ্গালীদের মনে থিয়েটার দেখিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" বাঙ্গলার প্রথমাভিনীত নাটক। তারপরে অভিনীত হয় নন্দকুমার রায় অনুদিত শকুন্তলা নাটক। এই শকুন্তলা দেখিয়াই পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বর চন্দ্র সিংহ, প্রতাপ চন্দ্র সিংহ এবং মহারাজা স্যার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর (তখনও হন নাই) একটী স্থায়ী নাট্যশালা স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করেন। ইহাই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বেলগাছিয়া থিয়েটার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, আর ইহার উদ্বোধন হয় রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' নাটক লইয়া। এই থিয়েটারের প্রথম অভিনেতা ছিলেন বাগ্‌বাজারের ৺কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী। ইনি বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইঁহার অভিনয় অতি সরস হইত *। আর মধুসূদন তাহাকে বলিতেন Roman Roscius, কখনও বলিতেন English Garrick —অতঃপর তাহাকে একখানি প্রসিদ্ধ নাটকও উৎসর্গীকৃত করেন।

এই রত্নাবলী নাটকের ইংরাজী অনুবাদ মধুসূদনই করিয়া দেন, কিন্তু নাটকখানি তাহার মনঃপূত হয় নাই। একদিন তিনি অন্যতম অভিনেতা ও তাঁহার (মধুসূদনের) বন্ধু গৌরদাস বসাক মহাশয়কে বলেন—

"গৌর, বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, একখানি তুচ্ছ নাটকের জন্য রাজারা এত অর্থব্যয় করিতেছেন!"

গৌর—উপায় কি? নাটক কৈ? তুমি কি বলিতে চাও, বিদ্যা-সুন্দরের অভিনয় করিব?

মধু—আচ্ছা, আমি নাটক লিখিয়া দিব।

গৌর—তুমি?

মধু—হাঁ, আমি!

গৌরদাস মধুসূদনের বাঙ্গলা বিদ্যার দৌড় জানিতেন। একবার 'পৃথিবী' কথাটির বানান 'প্রথিবী' লিখিয়া খুব জোরের সহিত

* Indian Stage Vol II pp. 61 এ, তাঁহার অভিনয়ের পরিচয় পাইবেন।

বলিয়াছিলেন, O, yes, it must be prathibi. গৌরবাবু এইরূপ কথায় খুব বিস্মিতই হইলেন। কিন্তু বিস্ময়ের অবধি রহিল না, যখন মধুসূদন সত্যই 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকখানির কয়েকটি দৃশ্যের পাণ্ডুলিপি আনিয়া তাহাকে দেখাইলেন। তাহার আনন্দেরও অবধি রহিল না। যথা সময়ে নাটকখানি সমাপ্ত হইল এবং ১৮৫৮এ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই নাটক লিখিবার পূর্ব্বে কয়েকখানি সংস্কৃত পুস্তক এবং বাঙ্গলা পুস্তক Asiatic Society হইতে পাঠ করিয়াছিলেন। নাটক সম্বন্ধে যতীন্দ্রমোহন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলেন :

"The best drama in the language—chaste, classical and full of genuine poetry."

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র বলেন "The drama is a complete success."

১৮২৪ সালে মধুসূদন জন্মগ্রহন করেন ও ১৮৩৭ সালে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৪২ সালে কলেজ হইতে অন্তর্ধান করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন ও ১৮৪৮শে মান্দ্রাজ গমন করেন ও রেবেকার সঙ্গে পরিণয়াবদ্ধ হন। সেখানে Spectator প্রভৃতি তিনখানি সংবাদ পত্রের সম্পাদনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন ও শিক্ষকতা কার্য্য করেন। ১৮৫৪ সালে Captive Lady প্রকাশ, কিন্তু বীটন সাহেব অতঃপরে মধুসূদনকে বঙ্গভাষায় লিখিতে উপদেশ দেন।

১৮৫৫—রেবেকার সহিত বিবাহ-চ্ছেদ ও হেনরিয়েটার সহিত বিবাহ।

১৮৫৬—২ ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন ও পুলিস কোর্টে ইণ্টার প্রিটারের (দোভাষীর) কার্য্যগ্রহণ।

১৮৫৮ বেলগাছিয়া থিয়েটার প্রতিষ্ঠা ও মধুসূদন কর্ত্তৃক রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ।

১৮৫৯ সালে প্যারীচাঁদ মিত্রের সহিত আলোচনায় মধুসূদন বলেন :

"আপনার ভাষা হচ্ছে—language of the fishermen.

Unless you import largely from Sanskrit, ভাষাই হ'তে পারে না। আমার ভাষা হবে চিরস্থায়ী—

প্যারীচাঁদ—"Ah, but that is not possible till the Greek Calends.

১৮৫৯—'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক রচনা ও অভিনয়

'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁা' প্রহসন রচনা,

১৮৬০—পদ্মাবতী নাটক ও কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনা, তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য রচনা।

১৮৬১-১৮৬২—মেঘনাদ বধ কাব্য রচনা—ব্রজাঙ্গনা কাব্য—আত্মবিলাপ, নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ, বীরাঙ্গনা-কাব্য, 'হিন্দু পেটি য়ট' সম্পাদনা কার্য্য।

১৮৬২—৯জুন বিলাত যাত্রা—'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা।

অল্পদিন পরে হেনরিয়েটার পুত্রকন্যা সহ স্বামীর নিকট গমন, দানবীর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে চিঠি ও তাঁহার সহানুভূতি ১৮৬৪—চতুর্দ্দশ কবিতাবলী রচনা (১৮৬৫). ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৬৬)

১৮৬৭—ফেব্রুয়ারী, স্বদেশ প্রত্যাগমন—ও ব্যারিষ্টারী ব্যবসা

১৮৭১—হেক্টর বধ কাব্য

১৮৭২—পঞ্চকোট গমন ও চাকুরী

১৮৭৩—ফেব্রুয়ারী ন্যাশনাল থিয়েটারে কৃষ্ণকুমারী নাটকের অভিনয় দর্শন, 'বেঙ্গল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ-দান, পীড়া, রোগশয্যায় 'মায়াকানন' ও 'বিষ কি ধনুর্গুণ' রচনা —মৃত্যু ২৯ জুন।

নাটকের গল্পাংশ এইরূপ:—

দেবযানী এবং শর্ম্মিষ্ঠা ছিলেন পরস্পর সখী। শর্ম্মিষ্ঠা দৈত্যরাজের

কন্যা আর দেবযানী দৈত্যরাজগুরু শুক্রাচার্য্যে কন্যা। একদিন জলকেলি করিতে করিতে উভয়েই ঝগড়া করেন। এবং মাত্রা এতই বাড়িয়া যায় যে উত্তেজিত হইয়া শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া চলিয়া যায়।

দৈবাৎ রাজা যযাতি তথায় আসিয়া তাহাকে জল হইতে উপরে উঠান। এই সংবাদ শুক্রাচার্য্যের নিকট পৌছিলে তিনি রাজ্য ছাড়িয়া যাইবেন বলিয়া ভয় দেখান, কিন্তু অবশেষে স্থির হয় শর্ম্মিষ্ঠা আজীবন দেবযানীর দাসীর ন্যায় তাহার সেবা করিবেন।

এদিকে দেবযানী যযাতির দেহ সৌষ্ঠব এবং দয়াগুণে অনুরক্ত হইয়া মনে মনে তাহাকেই পতিরূপে কামনা করেন। শুক্রাচার্য্য জানিতে পারিয়া শিষ্য কপিলকে প্রতিষ্ঠানপুরীতে পাঠাইয়া দেন এবং যযাতি সম্মত হইলে পরিণয় সম্পন্ন হয়। শর্ম্মিষ্ঠাও রাজ্ঞী দেবযানীর সহগামিনী হয় এবং একটী উদ্যানে তাহার বাসস্থান নির্দ্ধারিত হয়। যযাতি একদিন সেখানে গিয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে তাহার প্রতি অনুরাগিনী দেখিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু ব্যাপারটি লুক্কায়িত থাকে। ক্রমে এই মিলনে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে তিনটী রাজকুমার প্রসূত হয়। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম পুরু। একদিন দেবযানী রাজার সঙ্গে আসিয়া তিনটি বালককে দেখিয়া বিস্মিত হয়, কিন্তু ক্রমে সমস্ত ব্যাপার উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে। দেবযানী ক্রোধান্ধ হইয়া সখী পূর্ণিকাকে লইয়া তাঁহার পিতা শুক্রাচার্যের নিকটে গমন করেন। কন্যার দুর্ভাগ্যের সংবাদ পাইয়া শুক্রাচার্য্য যযাতিকে যাবজ্জীবন জরাগ্রস্ত হওয়ার জন্য অভিসম্পাত করেন। শাপগ্রস্ত নৃপতি গুরুর চরণতলে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। দেবযানীও স্বামীর প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্য পিতাকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। অবশেষে শুক্রাচার্য্য প্রসন্ন হইয়া বলিলেন "অপর কেহ যদি তোমার জরা গ্রহণ করে, তাহা হইলেই তুমি

জরা মুক্ত হইবে।" কিন্তু যযাতির পুত্রগণের মধ্যে কেহই তাঁহার পরিবর্ত্তে জরা ভোগ করিতে স্বীকৃত হইল না, না দেবযানীর পুত্রদ্বয়, না—শর্ম্মিষ্ঠার প্রথম দুইপুত্র। কেবল তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার জরা নিজে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে যযাতির জরাও পুরুকে আক্রমণ করিল। যৌবন প্রাপ্ত যযাতির হস্তে এবার গুরুদেব প্রসন্নচিত্তে শর্ম্মিষ্ঠার দাসীত্ব মোচন করিয়া তাহাকে স্বয়ংই অর্পণ করেন। দেবযানীও এখন হইতে তাহাকে সখী বলিয়া গ্রহণ করেন। এটুকুই নাটকে আছে কিন্তু অতঃপরে দীর্ঘকাল সাংসারিক সুখভোগ করিয়া যযাতি যে পুত্রের নিকট হইতে জরা-ভার পুনরায় গ্রহণ করিয়া পুরুকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করেন, এইটুকু নাটকে নাই।

পুরুর বংশধরগণ পৌরব নামে খ্যাতি লাভ করেন। মহাভারতের বিখ্যাত কৌরব এবং পাণ্ডবগণ পুরু রাজারই বংশধর।

এখন এই নাটকখানি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত নাটক রচিত হইয়াছে, তুলনা করিলে শর্ম্মিষ্ঠাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ইহার উপাদান মহাভারতের যযাতি উপাখ্যান হইতে গৃহীত বটে, কিন্তু অনাবশ্যকীয় বিষয় বর্জ্জন করিয়া এবং আবশ্যকীয় বিষয় নাটকোপযোগী করিয়া মধুসূদন যথার্থ মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপ এবং উত্তোলন ব্যাপারটা বকাসুরের মুখে দিয়া তিনি ভালই করিয়াছেন! শর্ম্মিষ্ঠা যে দেবযানীর দাসীত্ব করিয়া আশ্রমে গমন করেন তাহাও এইরূপ পরোক্ষে বর্ণিত হইয়াছে।

দেবযানীর প্রণয়-সঞ্চার ও অধৈর্য্য, শুক্রাচার্য্যের এই সংবাদ রাজসমীপে প্রেরণ, শর্ম্মিষ্ঠার সন্তোষচিত্ততা প্রভৃতি প্রথম অঙ্কে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কে যযাতির বিবাহে সম্মতি এবং বিবাহার্থে মুনির আশ্রমে আগমন ও তৃতীয়াঙ্কে শর্ম্মিষ্ঠার প্রণয়

সঞ্চার, শর্ম্মিষ্ঠার দৈত্যপুরে যাইতে অসম্মতি এবং যযাতির সহিত বিবাহের কথা আছে। চতুর্থ অঙ্কে রাজ্ঞী দেবযানীর শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভজাত তিনটি পুত্রের সহিত সাক্ষাতের কাহিনী, দেবযানীর প্রতিহিংসা-পরায়ণতা ও শুক্রচার্য্যের অভিশাপে যযাতির জরাগ্রস্ত হওয়া এবং তজ্জন্য দেবযানীর আত্মগ্লানির কথা আছে। পঞ্চমাঙ্কে শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক শর্ম্মিষ্ঠাকে যযাতির হস্তে অর্পণ এবং দেবযানীর তজ্জনিত তৃপ্তির কথা আছে।

নাটকখানি মিলনান্ত। শেষ দৃশ্যটি অতি নিপুণভাবে সংযোজিত হইয়াছে। ইহা দ্বিজেন্দ্রলালের চন্দ্রগুপ্ত নাটকের শেষ মিলন দৃশ্যটি স্মরণ করাইয়া দেয়। যযাতির পুনরায় জরাগ্রহণের কথা না থাকায় ভাল হইয়াছে। 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকের শেষ দৃশ্যে শাপমুক্ত যযাতি, রাজ্ঞী দেবযানী, শর্ম্মিষ্ঠা, শুক্রাচার্য্য, বিদূষক, 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের যথাক্রমে চন্দ্রগুপ্ত, হেলেন, ছায়া, চাণক্য ও চন্দ্রকেতুরই পূর্ব্ব সংস্করণ।

শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে শর্ম্মিষ্ঠাই প্রধান চরিত্র। মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্র বাবু যে বলেন, দেবযানীর আওতায় পড়িয়া শর্ম্মিষ্ঠা চরিত্র দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে, এই উক্তি আমরা স্বীকার করিতে পারিলাম না। দেবযানী স্বভাবতঃই প্রেমপ্রবণা, কোপনস্বভাবা এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ', আর শর্ম্মিষ্ঠা ধৈর্য্যশালিনী, শান্তস্বভাবা ও ক্ষমাশীলা। মহাভারতের এই পরিকল্পনা মধুসূদন ঠিকই রাখিয়াছেন। ভীষ্মার্জ্জুন, যুধিষ্ঠির, অভিমন্যু প্রভৃতি যে বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন সেই চন্দ্রবংশের শ্রেষ্ঠ আত্মত্যাগী পুরুর গর্ভধারিণীর ধৈর্য্যশীলতা মধুসূদন যথাযথ ভাবেই দেখাইয়াছেন। ফণিনীর ন্যায় ক্রোধোন্মত্তা দেবযানী সম্বন্ধে শর্ম্মিষ্ঠা সখী দেবিকাকে বলিতেছে—

"দেবযানীকে কি তোমার ভৎ‍র্সনা করা উচিত? পতিপরায়ণা

স্ত্রীর পতি অপেক্ষা আর প্রিয়তর অমূল্যরত্ন কি আছে বল দেখি ?"

শর্ম্মিষ্ঠা রাজকন্যা হইয়াও যে দেবযানীর দাসীত্ব করিতেছে, ইহাতেও তাহার সমানই সন্তোষ—

"সুখদুঃখ মনের ধর্ম্ম, আমি পূর্ব্বে যেরূপ ছিলাম, এখনও সেইরূপ আছি।"

শাপগ্রস্থ স্বামীর শুশ্রূষা, এবং অনুতপ্তা দেবযানীর প্রতি প্রবোধ বাক্য তাহারই চরিত্রানুরূপ। অনুতপ্তা দেবযানীকে শর্ম্মিষ্ঠা শেষ দৃশ্যে বলিতেছে—

"প্রিয় সখি, তোমার দোষ কি! এ সকল বিধাতার লীলা বৈত নয় ?"

মহাভারতে উল্লিখিত আছে শর্ম্মিষ্ঠা ঋতুরক্ষার জন্য যযাতির শরণাপন্ন হন। মধুসূদন উভয়ের মধ্যে যথার্থ অনুরাগ আরোপ করিয়াছেন। যখন রাজা কাছে আসেন, সলজ্জভাবে শর্ম্মিষ্ঠা বলিতেছে—

"আপনি এ দাসীকে ক্ষমা করুন, শশধর কি কুমুদিনী ব্যতীত অন্যকুসুমে কখনও স্পৃহা করেন ?"

শর্ম্মিষ্ঠা চরিত্রাঙ্কনে নাট্য-কারের কৃতিত্ব খুবই বেশী। শুক্রাচার্য্য চরিত্রে অপত্য-স্নেহের মোহ ফুটিয়াছে। তিনি প্রথমে কন্যাকে বুঝাইয়াছিলেন "গান্ধর্ব্ব বিবাহে যে ক্ষত্রিয় কুলের রীতি, তাকি জান না ?" আর শাপগ্রস্থ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া প্রথমে তিনি কর্ণে হাত দিয়া বলেন "আমি এ অধর্ম্ম কি প্রকারে করি ? রাজা যযাতি পরম দয়ালু পুরুষ।"

দেবযানী চরিত্রও যথাযথভাবেই চিত্রিত হইয়াছে। শর্ম্মিষ্ঠাতে হেনরিয়েটার ছায়া প্রতিফলিত বলিয়া মনে হয়।

পুরুকে কবি নাটকোক্ত ব্যক্তিরূপে দেখান নাই। যযাতি

ও মন্ত্রীর মুখে চরিত্রের অপ্রত্যক্ষ কিন্তু আশ্চর্য্য বিশ্লেষণ হইয়াছে। দেবযানীকে দেখিয়া পুত্রত্রয় স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, এবং রাজ্ঞী যখন বলেন "বৎসগণ, তোমরা কিছুমাত্র শঙ্কা ক'রনা", তাহাতে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র সক্রোধে স্বীয় কোমল বাহু আস্ফালন করিয়া উত্তর করে—

"আমরা কাকেও শঙ্কা করিনা। তুমি কে? তুমি যে আমাদের পিতার হাত ধরেছ? তুমিতো আমাদের জননী নও, তিনি হ'লে আমাদের কত আদর কর্ত্তেন।"

এই বালকই অবশেষ পিতার প্রাণে শক্তি দিয়া বলেন "আপনার এ জরা রোগ আমি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।" নাটকে এই অংশ থাকিলে এবং কোন শিশুদ্বারা প্রকৃত ভাবে অভিনীত হইলে ভাল হইত। কিন্তু নাট্যকার সেরূপ সুবিধা দেন নাই।

সমস্ত দেখিয়া মনে হয়, নাটকখানি বেশ ভাল হইয়াছে এবং যোগীন্দ্রবাবু আরোপিত কৃত্রিমতা দোষ লক্ষিত হয় না। বস্তুতঃ নাটকের দোষ গুণ বিচার করিলে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে কোন নাট্যকারেরই প্রথম নাটক এতাবৎ এত ভাল হয় নাই। তবে প্রথম নাটক বলিয়া যে ত্রুটি থাকা সম্ভব, তাহা রহিয়াছে। প্রধান চরিত্রগুলি পরিপুষ্ট হয় নাই। ক্ষীণতা দোষ পরিলক্ষিত হয়।

বেলগাছিয়া থিয়েটারে শর্ম্মিষ্ঠা প্রথমে অভিনীত হয় ১৮৫৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে।

নিম্নলিখিত মণীষীগণ ভূমিকা গ্রহণ করেন :—

রাজা যযাতি—প্রিয়নাথ দত্ত (তাঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় যদুনাথ চ্যাটার্জ্জি রাজার ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন) মাধব্য—বসন্তক কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী—সেই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা। শুক্রাচার্য্য দীননাথ ঘোষ।

কপিল (শুক্রাচার্য্যের শিষ্য)—শরৎচন্দ্র ঘোষ (পরে বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনেতা)
বকাসুর (সেনাপতি)—রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ
দৈত্য (জনৈক কর্ম্মচারী)—তারাচাঁদ গুহ

(দৈবাৎ ঘোড়া হইতে পড়িয়া রাজার হাত ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তারাচাঁদ বকাসুরের ভূমিকা গ্রহণ করেন)

নাগরিক—হরিশচন্দ্র মুখার্জ্জি, রসিকলাল সাহা, ব্রজলাল দত্ত।
পারিষদবর্গ—যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্রিয়নাথ শেঠ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র।
চোপদার—দ্বারকানাথ মল্লিক (পরিশেষে মহেশচন্দ্র এই ভূমিকা গ্রহণ করেন।)
দ্বারবান—মণীন্দ্র ঘোষ (রাজার শ্যালক)
দেবযানী—হেমচন্দ্র মুখার্জ্জি (ইনি রত্নাবলী নাটকে সাগরিকার ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন)
পূর্ণিকা—কালিদাস সান্যাল (পূর্ব্বে নর্ত্তকীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন)
শর্ম্মিষ্ঠা—কৃষ্ণধন মুখার্জ্জি (নবাগত এবং উৎকৃষ্ট অভিনেতা)
দেবিকা—অঘোরচন্দ্র দিঘরিয়া (ইনি সুসঙ্গতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন)
নট—ব্রজ দুর্ল্ভ দত্ত নটী—চুণীলাল বসু
পরিচারিকা—কালীপ্রসন্ন মুখার্জ্জি।*

রত্নাবলী নাটকের ন্যায় শর্ম্মিষ্ঠাও লোকপ্রিয় হইবে কি না সে সম্বন্ধে রাজা ঈশ্বর চন্দ্র সিংহের সন্দেহ ছিল। কিন্তু উহার অভিনয় খুব

---

* ৺যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত মধুসূদনের জীবন চরিত, পৃষ্ঠা ২৩৩—কে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিবেন তাহা স্থির করিয়া ১৮৫৯ সালের ২৪শে মার্চ্চ তারিখে গৌরদাস বসাকের নিকট লিখিত রাজার পত্র হইতে সংগৃহীত। অনুশীলন এবং পুরোহিত জ্যৈষ্ঠ ১৩০২—'রঙ্গভূমির ইতিবৃত্ত' দেখুন।

সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল এবং তৎকালীন সংবাদপত্র সমূহে নাটক এবং নাট্যাভিনয়ের শিক্ষিত সমাজ কিরূপ উপভোগ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে 'হিন্দুপেট্রিয়ট' সম্পাদক প্রসিদ্ধ গিরিশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মন্তব্য পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে—

"শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয় দুই হাজার বৎসর অতীতযুগের ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান করিয়াছিল। বস্তুতঃ সেই অতীত যুগের আচার ব্যবহারের উপযোগী করিয়া নাটকের দৃশ্যপট ও সাজ সরঞ্জামের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

"আমাদের যে সকল পুরাতত্ত্ববিদ্ বন্ধু সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন সাজসজ্জাদি সমস্তই প্রাচীন ভারতের অনুরূপই হইয়াছিল। কণ্ঠ হইতে পদ পর্য্যন্ত লম্বিত শুক্রাচার্য্যের ধূসর সবুজ বর্ণ মণ্ডিত পোষাকটি বড়ই ঘটনার কালের উপযোগী হইয়াছিল। এই পোষাকের এবং আমাদের বর্ত্তমান যুগের পোষাকের মধ্যে পার্থক্য অনেকখানি এবং দর্শকবৃন্দ সকলেই উহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। রাজসভার দৃশ্যও বেশ জমকাল হইয়াছিল। রাজ-পরিষদ্‌দিগের ব্যবহার এমন অবিকল হইয়াছিল যে যাঁহারা আমাদের দেশের লোকের উহা অভাব বলিয়া মনে করেন একবার এই অভিনয় দর্শন করিলে তাঁহাদের ভ্রম-ধারণা দূর হইবে।

"অভিনয় সম্বন্ধে একথা আমরা আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেছি যে উহাতে আতিশয্য কোথাও কিছু ছিল না। যদিও প্রথম দিকটায় সজীবতার কিছু অভাব লক্ষিত লইয়াছিল তথাপি অভিনয় খুব স্বাভাবিক হইয়াছিল এবং অভিনয় যতই শেষের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল ততই লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং উহাই সজীবতার অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।" পূর্ব্ববর্ত্তী অভিনয়ের ন্যায় এই অভিনয়েও বিদূষক ছিল সমস্ত অভিনেতা-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কল্পনার স্বচ্ছন্দ গতি, চমৎকার সজীবতা, খেয়ালী

ভাব, প্রচুর নাট্যরসের সৃষ্টি করিয়াছিল। যে সচ্ছন্দ ভাব, এবং মাধুর্য্য তিনি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে প্যারিস অথবা লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চেও তাঁহাকে ঠিকই মানাইত। অন্যান্য অভিনেতাগণও তাঁহাদের যোগ্যতা অনুসারে ভালই অভিনয় করিয়াছেন এবং দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।"

অন্যান্য দিক দিয়াও শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের বিশেষত্ব আছে। শর্ম্মিষ্ঠা বাঙ্গালার নাট্যজগতে নবযুগের সূচক। এই নাটকে মধুসূদন কিছু নূতনত্বের সংযোগ করিয়াছিলেন এবং নাটক রচনায় মধুসূদনকে প্রধান সংস্কারক বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বস্তুতঃ সংস্কৃত নাটক রচনার চিরাচরিত প্রথা পরিত্যাগ করিবার মধুসূদনই প্রথম পথ প্রদর্শক। "ভদ্রার্জ্জুন" নাটকে (১৮৫২) প্রথম নান্দী প্রভৃতি বর্জ্জিত হইয়াছে। কিন্তু ভদ্রার্জ্জুন লোকের আগ্রহ আকর্ষণ করিবার পক্ষে অনুপযুক্ত ছিল। অবশ্য কালীপ্রসন্ন সিংহও ক্রমশঃ পুরাতন পদ্ধতি বর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু মধুসূদনই পূর্ব্ব পদ্ধতি বর্জ্জনে প্রচণ্ড আঘাত হানিলেন, তিনি প্রথম হইতেই সংস্কৃত নাটকের আদর্শ এবং পুরাতন রীতি বর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি "রত্নাবলী" নাটকের অনুবাদের মুখবন্ধে ইহার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন :—

"এক দল লেখক যাহারা সংস্কৃত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া উচ্চতর আদর্শের সন্ধান করিবে।" তৎকালীন বিখ্যাত সংস্কৃত ভাষাবিদ্ মহামহোপাধ্যায় প্রেমচাঁদ তর্কবাগীস শর্ম্মিষ্ঠা নাটক পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন "ইহা নাটকই হয় নাই, বোধ হয় কোন ইংরেজী জানা নব্য বাবু ইহা লিখিয়াছে। কোন পরিবর্ত্তন করিতে হইলে নাটকখানিকে আগাগোড়া পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।" কিন্তু মধুসূদনের কোন সংস্কৃত নাটকের সাহায্য প্রয়োজন ছিল না, তিনি

নিজের পায়েই দাঁড়াইতে চাহিয়াছিলেন। তাই তাঁহার বন্ধু গৌরদাস বসাককে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"ভাই গৌর, আমি জানি আমার নাটকে বৈদেশিক ভাব কিছু থাকিবে। সংস্কৃত যাহা কিছু তৎসমস্তের প্রতিই আমাদের দাস-সুলভ মনোভাবের ফলে আমরা আমাদের নিজেদের জন্য যে শৃঙ্খল সৃষ্টি করিয়াছি তাহা হইতে মুক্ত হওয়াই আমার উদ্দেশ্য।"

কিন্তু মধুসূদন দত্ত নাটক রচনায় প্রাচীন পদ্ধতি এবং রীতি সম্পূর্ণ-রূপে বর্জন করিতে পারেন নাই। প্রস্তাবনা, বিদূষক, কঞ্চুকী প্রভৃতি চরিত্রের অবতারণা সংস্কৃত নাটকের অনুকরণেই হইয়াছে। তথাপি সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে এই কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে নাটক রচনায় এক নূতন পথ তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী নাট্যকারগণ সকলেই তাঁহার প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করিয়াছেন।

শর্ম্মিষ্ঠা অভিনয়ের পরে মধুসূদন এত উৎসাহ পাইতে লাগিলেন যে তাঁহার প্রতিভা এখন উপযুক্ত সহায়তা লাভে স্রোতস্বতীর মত তর তর বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। যাহা সুপ্ত ছিল, মৃতের ন্যায় বোধ হইত, 'জিওন কাঠি'র সহায়তায় এখন নব নব সাহিত্য রচনা করিতে লাগিল—প্রথমে নাটক ও পরে প্রহসন। কিন্তু রচনার বিকাশ হইলেও নাটক আর শীঘ্র অভিনীত হয় নাই। বাধা তাঁহার প্রতিভা ভিন্ন মুখে প্রধাবিত করিল! অতঃপরে একেবারে অমর কাব্যই রচিত হইতে লাগিল। নূতন ছন্দ বাহির হইল, কত অমূল্য রত্ন প্রসূত হইল, আমরা বাঙ্গালার মিল্‌টনকে পাইলাম। এতদিনে জয়দেবের শূন্য স্থান অধিকৃত হইল। তাই বলিতেছিলাম 'বেলগাছিয়া থিয়েটার' কেবল রঙ্গমঞ্চের নয়, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসেও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করিতেন সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ

অথবা যাঁহারা কলেজে খুব বেশী পড়েন নাই—যেমন ঈশ্বর গুপ্ত, অক্ষয় দত্ত, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি। কিন্তু কলেজের ইংরাজী ভাষায় খুব বেশী শিক্ষিত লোক ধরিতে গেলে এ পথের অনুবর্ত্তী ছিলেন মধুসূদনই প্রথম। এই হিসাবেও মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। স্বর্গীয় রমেশ দত্ত মহাশয় এ বিষয়ে লিখিয়াছেন—

"The alumni of the Hindu College had hitherto looked into contempt on Bengali literature, had written prose and verse in English and hoped to distinglish themselves in English literature. The truth came like a flash of inspiration to Madhusudan Dutta. The true genius mistakes its vocation when it struggles in a foreign tongue. Madhusudan had to correct his mistake and to be the first eminent poet in his own language."

Literature of Bengal. p. 186

অতঃপরে ১৮৬৯ সালে মধুসূদন "একেই কি বলে সভ্যতা" এবং "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" নামক দুইখানি প্রহসন রচনা করেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরোধেই তাহার এই প্রচেষ্টা। এই প্রহসন দুইখানির বিস্তৃতালোচনা গ্রন্থকার তাহার ইণ্ডিয়ান ষ্টেজ গ্রন্থে* করিয়াছেন, এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। প্রথমখানিতে ইয়ং বেঙ্গলের এবং দ্বিতীয়খানিতে ভণ্ডসাধু-প্রকৃতি ভক্তপ্রসাদের অসঙ্গত আচরণের প্রতি তীব্র কশাঘাত করা হইয়াছে। প্রহসন দুইখানি বেলগাছিয়া থিয়েটারে অভিনীত হয় নাই। কবি মধুসূদন ইহাতে অত্যন্ত মনঃক্ষুন্ন হন।

Indian Stage Vol II (Revised Edition pp. 77-80)

ইহার পরে মধুসূদন 'সুভদ্রা' নামক একখানি নাটক রচনা করেন। উহা নাট্যকাব্য মাত্র, উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু নাই। অতঃপরে তিনি পাঠান ইতিহাস হইতে আখ্যান-বস্তু সংগ্রহ করিয়া 'রিজিয়া' নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার ধারণা ছিল তেজস্বিতায় মুসলমান জাতি আমাদের অপেক্ষা প্রশংসার্হ। এ নাটকও অভিনীত হয় নাই। অতঃপরে বেলগাছিয়া থিয়েটারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলীর অনুরোধে টডের রাজপুত ইতিহাস হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া একমাস মধ্যে (১৮৬০,৬ আগষ্ট হইতে ৭ সেপ্টেম্বর মধ্যে) "কৃষ্ণকুমারী নাটক" সমাপ্ত করেন। এখানি বেলগাছিয়া অভিনীত হয় নাই, তবে ছয়বৎসর পরে শোভাবাজার রাজবাড়ীর থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। মধুসূদন তখন উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু ন্যাসনাল থিয়েটারে ১৮৭৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী যখন অভিনীত হয় মধুসূদন উপস্থিত থাকিয়া ভীমসিংহের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের, ধনদাসের ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর, অহল্যার ভূমিকায় মহেন্দ্র বসুর, কৃষ্ণকুমারীর ভূমিকায় ক্ষেত্র গাঙ্গুলীর এবং বিলাসবতীর ভূমিকায় বেলবাবুর অভিনয় দেখিয়া বড়ই তৃপ্ত হইয়াছিলেন।

পদ্মাবতী মধুসূদনের দ্বিতীয় নাটক। এই নাটকখানি গ্রীক উপকথা 'Apple of Discord'এর ছায়াবলম্বনে তিনি রচনা করিয়াছেন। নাটকোক্ত শচী, রতি, নারদ, রাজা ইন্দ্রনীল এবং রাজকুমারী পদ্মাবতী যথাক্রমে গ্রীক জুনো, ভেনাস, ডিস্কর্ডিয়া, প্যারিস এবং হেলেনের প্রতিচ্ছায়া হইলেও চরিত্রাঙ্কনে এবং কলানৈপুণ্য মধুসূদনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ গ্রীক নাটকের ন্যায় মধুসূদনের পদ্মাবতী বিয়োগান্ত নয়। ইন্দ্রনীল এবং পদ্মাবতীর মিলন সঙ্ঘটিত হইয়াছে। স্ত্রী চরিত্র মধ্যে পদ্মাবতী কোমল হৃদয়, আর শচীদেবী খুব সজীব, তবে চরিত্রের পরিকল্পনাও গ্রীক আদর্শে হইয়াছে। পদ্মাবতী মধুসূদনের সম্মুখে গ্রন্থরচনার সাতবৎসর পরে বড়তলা জয়মিত্রের বাড়ী

অভিনীত হয়। ইন্দ্রনীল হন বেহারী চট্টোপাধ্যায়, বিদূষক মণিমোহন সরকার, কলি জীবনকৃষ্ণ দেব, 'ডিসব্যাণ্ডেড্ মদনিকা কলি অবতার' ভারতীয় নাট্যমঞ্চে বর্ণিত হইয়াছে।*

এই নাটকেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম ব্যবহৃত হয়। এপর্য্যন্ত নাটকে ত্রিপদী পয়ার প্রভৃতি অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু গুরুগম্ভীর ভাব যে উৎকৃষ্ট ছন্দও নাটকে খুব ভাল মানাইতে পারে, মধুসূদনই প্রথমে তাহা দেখাইয়াছেন। যেমন—

কলি (স্বগত)—ঐ শুন

বীরদর্পে তা সবার সঙ্গে যুঝে এবে
  ইন্দ্রনীল। (চিন্তা করিয়া)
এই অবসরে যদি আমি
রাণী পদ্মাবতীরে লইতে পারি হরি
তা' হ'লে কামনা মোর হবে ফলবতী—
প্রেয়সী-বিরহ শোকে ইন্দ্রনীল রায়
হারাইবে প্রাণ, ফণী মণি হারাইলে
মরে বিষাদে। এ হেতু সারথির বেশে
আসিয়াছি হেথা আমি (পরিভ্রমণ)

পদ্মাবতীতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের যে সূচনা হয়, তাহাই ক্রমে নাটকের কথোপকথনের অন্যতম টেক্‌নিক' করিবার তাহার সঙ্কল্প ছিল। তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য, মেঘনাদ বধ কাব্যে তিনি যে তেজোগর্ভ অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তন করেন, অন্যলোকের কাব্যে ও নাটকেও পরে তাহা প্রচলিত হয়। এই বিষয়ে তিনি পূর্ব্বেই স্পষ্ট ভাবে লিখিয়াছিলেন—

* গ্রন্থকার প্রণীত ভারতীয় নাট্যমঞ্চ ২১ পৃঃ Indian Stage vol II (2nd Ed)—p 141

"I am of opinion that our drama should be in blank verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees. If I should live to write other dramas, you may rest assured I shall not allow myself to be bound by the diction of Mr. Viswanath of the Sahitya Darpan. I shall look to the great dramatists of Europe for models."

নাট্যরচনায় মধুসূদনের আদর্শ যে খুব উচ্চ ছিল তাহার প্রমাণ শর্ম্মিষ্ঠার প্রস্তাবনায়। মধুসূদন নিজেই উহা রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে তদানীন্তন অধোগতিপ্রাপ্ত নাট্যকলার উন্নতিপ্রয়াসই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে—

"কোথায় বাল্মিকী ব্যাস, কোথা তব কালিদাস
কোথা ভবভূতি মহোদয়
অলীক কুনাট্যরঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়
সুধারস অনাদরে বিষবারি পান করে
তাহে হয় তনু মন ক্ষয়।
মধু কহে জাগো মা গো, বিভুস্থানে এই মাগো
সুরসে প্রবৃত্ত হ'ক তব তনয় নিচয়।"

পদ্মাবতী নাটক রচিত হয় ১৮৬০ সালে, আর অভিনীত হয় ১৮৬৭ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর। কিন্তু নাটকখানি প্রথমে গদ্যে রচিত হয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কিছুই ছিল না। ইতিমধ্যে লোকে মেঘনাদবধের অমিত্রাক্ষর ছন্দ 'গৌড়জন আনন্দে সুধার ন্যায়ই পান করিতেছিল'। অভিনয়ের সময় মধুসূদন পদ্মাবতী নাটকেও এই ছন্দের কতকটা কথা কলির মুখে আরোপ করেন। কিরূপে সাতবৎসর পরে তাহা সম্ভব হয়, সেই সম্বন্ধে 'মধুস্মৃতি' প্রণেতা স্বর্গীয়

নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় যে আখ্যানটি দিয়াছেন নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম—

"কলিকাতার বড়তলায় 'পদ্মাবতী' নাটকের অভিনয় হয়। জয় মিত্রের গলির পাঁচকড়ি মিত্র, ক্ষীরোদ মিত্র, বিডন ষ্ট্রীটের শরৎ ঘোষ প্রমুখ প্রসিদ্ধ ধনিপুত্রগণ অভিনয়ের আয়োজন করেন। তাঁহারা পরামর্শের নিমিত্ত মধুসূদনকে সর্ব্বদা লইয়া আসিতেন, মধুসূদনও যাহাতে অভিনয় উৎকৃষ্ট হয়, সেইজন্য সতত তাহাদিগকে উপযুক্ত সুপরামর্শ দান করিতেন। 'পদ্মাবতী নাটক' প্রথমে আদ্যোপান্ত গদ্যে লিখিত হয়। তাঁহারা তাঁহাকে ঐ নাটকের কিয়দংশ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিলে মধুসূদন বলেন "তবে বুড়ী বেটীকে ডাকি"। পরে তাহাদিগকে বলিলেন "তোরা লেখাপড়া ত কিছু করিস্ নি? তোদের ভিতর কি কেউ কলম ধরতে পারে?" তখন মণিলাল সেন নামক ছোট আদালতের জনৈক উকীল কাগজ কলম লইয়া বসিলেন। মধুসূদন তখন নাটকের অঙ্কের গদ্যাংশ দেখিয়া এমনভাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দে উক্ত অংশ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন যে সকলের মনে হইল, তিনি পুস্তক দেখিয়া শ্রুতিলিখন (dictation) লিখাইতেছেন।

"উক্ত সম্প্রদায়ের নাম ছিল The Bengal Amateur Theatrical Society. ইংরাজী ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে ২৪৬ নং চীৎপুর রোডের বিশাল অট্টালিকার দ্বিতল হলে "পদ্মাবতী নাটক" প্রথম অভিনীত হয়। নর্ত্তকী বেশে বালকগণের নৃত্য বড়ই মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল। তাহাদিগের সাজসজ্জা পরিচ্ছদের পারিপাট্য মধুসূদনেরই উপদেশানুসারে ব্যবস্থিত হয়।"*

বাঙ্গলা নাটকের মধ্যে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'ই প্রধান ট্রেজিডি বা

* "মধুস্মৃতি" নগেন্দ্র নাথ সোমের পৃঃ ৪৭১

বিয়োগান্ত নাটক। ইহাতেও মনে হয় গ্রীক ট্রেজিডি এবং বিয়োগান্ত নাটক মধুসূদনের উপরে রেখাপাত করিয়াছিল।

ইহা প্রথম ঐতিহাসিক নাটকও। উদয়পুরের রাণা ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারীর বিবাহযোগ্য বয়স হইলে জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ পাণিপ্রার্থী হইয়া বিদূষক ধনদাসকে অনুচর-বর্গ সহ প্রেরণ করেন। কিরূপে বিলাস-ভোগ্যা বিলাসবতীর সখী চতুরা মদনিকার সহায়তায় তাহার এই প্রস্তাব ব্যর্থ হয়, কিরূপে রাণা প্রতিদ্বন্দ্বী পাণিপ্রার্থী জয়পুরের রাজা ও মরুদেশপতি রাজা মানসিংহের দুইজনের একের অসন্তুষ্টিতে চিতোর ধ্বংস অনিবার্য্য জানিয়া সহোদর বলদেব সিংহের পরামর্শ মত খড়্গের সহায়তায় কন্যাহত্যার ব্যবস্থা করেন এবং কিরূপে কন্যার মৃত্যুতে উন্মত্তবৎ হইয়া যান, এই পঞ্চাঙ্ক নাটকখানিতে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

নাটকখানির রচনা প্রশংসার্হ, কিন্তু প্রথম ট্রেজিডি হইলেও নাটকের ঘাত প্রতিঘাত নাই। সরস চরিত্র হইয়াছে মদনিকার। ধনদাসের চরিত্র আশানুরূপ হয় নাই। মাঝে মাঝে এক নিম্নাঙ্গের তরলতা আসিয়াছে। তপস্বিনী ও বিলাসবতী চিত্রাঙ্কণে তুলি অসংলগ্ন হয় নাই। একজন অহল্যাকে ও কৃষ্ণকুমারীকে সান্ত্বনা দেন, আর একজন হীন চরিত্রা হইলেও, ইহাতে কোনরূপ ক্ষুদ্রতা আরোপিত হয় নাই। ভীমসিংহের মধ্যে রাণার চরিত্রানুরূপ দৃঢ়তার কোন নিদর্শন নাই। অহল্যার কন্যাস্নেহ এবং দৃঢ়তা স্বল্প কথায় সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে। কৃষ্ণকুমারী মৃদু-স্বভাব হইলেও দৃঢ়চিত্ততা এবং চিতোর রক্ষায় পদ্মিনীর আদর্শানুরূপ তাহার আত্মত্যাগের দরুণ এই ক্ষীণ চরিত্রও সকলের সহানুভূতি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। তাহার উক্তি—

"কুলমান রক্ষার্থে কিম্বা পরের জন্য যে মরে সেই চিরস্মরণীয়" বড় মর্ম্মস্পর্শী। শেষ দৃশ্যটী বড়ই বিষাদ-পূর্ণ এবং ভীমসিংহের

শেষাবস্থায় অনুরূপ উন্মত্ততা প্রদর্শিত হইয়াছে। কৃষ্ণার মৃত্যুর পরে ভীমসিংহের প্রলাপ বাক্য খুবই মর্ম্মস্পর্শী—

"আঃ, (অগ্রসর হইয়া) মহিষি যে। হস্ত ধরিয়া দেখ, তুমি তোমার কৃষ্ণাকে দেখ্‌চো, কৈ।"

ত্রুটী বিচ্যুতি থাকিলেও বাঙ্গলার প্রথম বিষাদান্ত নাটকখানি মোটের উপরে মন্দ বলা যায় না। বরং ইহার প্রকৃষ্ট অভিনয়ের গুণে মধুসূদনের মনে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আরও বদ্ধমূল ধারণা হইয়াছে। ভীমসিংহের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াই বিয়োগান্ত ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র যে শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেন, মৃত্যুর শেষদিন পর্য্যন্ত তাহা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইয়াছে। কখনও বা কোন অবস্থায়ই ম্লান হয় নাই।

কৃষ্ণকুমারী নাটকে ইতিহাসের সত্যতা রক্ষিত হইয়াছে এবং তখনকার অবস্থায় উহা একখানি উৎকৃষ্ট নাটক।*

মধুসূদন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। বঙ্গীয় কবি-গণের মধ্যে তাহার স্থান যে কত উচ্চ, তাহা সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় স্বীকার করিয়াছেন। মেঘনাদ বধ কাব্য হইলেও, তাহাতে যথেষ্ট নাটকের বীজ নিহিত আছে। গিরিশচন্দ্র উহা নাটকান্তরিত করিয়া আবার সেই গ্রন্থের অপরিমেয় সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। যতি, ছন্দ ও ভাব রক্ষা করিয়া উহাকে এমন ভাবে নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছে, ঐখানিকে নাটকও বলা চলে। নাট্যকার হিসাবে মধুসূদন প্রথম শ্রেষ্ঠ সংস্কারক, প্রথম ঐতিহাসিক নাটক রচয়িতা এবং প্রথম বিষাদান্ত নাটক-প্রণেতা। কথোপকথনের নূতন টেক্‌নিক্‌ও তাহারই প্রথম সৃষ্টি। সুতরাং বাঙ্গলা নাটকের ইতিহাসে বহুগুণ-সম্পন্ন মধুসূদনের যে বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে,

* অমৃতলাল বসু বলেন, "মাইকেল বিলাতী classic ধরণের ট্র্যাজিডির আদর্শ কৃষ্ণকুমারীতে দেখাইলেন।"

তাহাতে আর সন্দেহ নাই। "জাতীয় নাট্যশালা" কথাও তাঁহারই প্রথম সৃষ্টি। আর থিয়েটারে স্ত্রীচরিত্র অভিনয়ের জন্য অভিনেত্রীর প্রবর্ত্তনও তাঁহার। মধুসূদনের পরামর্শমতেই থিয়েটারে প্রথম স্ত্রী অভিনেত্রী নিয়োজিত হয়।

মধুসূদনের শেষ নাটক "মায়াকানন"। বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য ইহা লিখিত হয়। কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটার খোলা হইবার পূর্ব্বেই ১৮৭৩, ২৯শে জুন তারিখে তিনি মহাপ্রস্থান করেন। পরে তাঁহারই শর্ম্মিষ্ঠা লইয়া বেঙ্গল থিয়েটার দেড়মাস পরে ১৬ই আগষ্ট তারিখে (১৮৭৩) উদ্বোধন করা হয়।

মধুসূদন মার্চ্চমাসে পীড়িত হইয়া পড়েন। অসুখের মধ্যেও 'মায়াকানন' এবং 'বিষ কি ধনুর্গুণ' নামক নাটক দুইখানি লিখিতে আরম্ভ করেন, প্রথমখানি শেষ হয়, দ্বিতীয়খানি অসমাপ্ত থাকে।

দুরারোগ্য রোগ, দারুণ অর্থকষ্ট, মানসিক অশান্তির মধ্যে এই বিয়োগান্ত নাটকখানি রচিত হয়। নাটকের মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য মধুসূদনের জীবনেরই করুণ কাহিনী। সকলেই জানেন মধুসূদন খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন, ইচ্ছানুরূপ ইংরাজ মহিলার পানিগ্রহণ করিবেন, বিলাত গিয়া সেখানকার সামাজিক জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশিবেন, এই মনোভাবেই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন, ধর্ম্মস্পৃহার জন্য নহে। কিন্তু এসব কিছুই হয় নাই, কেবল পিতার অভিশাপ এবং বিতৃষ্ণারই অধিকারী হইয়াছেন। বন্ধুবান্ধবও কেহ বড় কাছে আসেন না, স্বদেশ হইল তাহার প্রবাস, পিতৃগৃহও অরণ্যের ন্যায় বোধ হইত। বস্তুতঃই সংসার ক্ষেত্রে তিনি 'মায়াকাননে' প্রবেশ করিয়াছিলেন, শান্তি আর কোথায় পাইতেন?

অতঃপরে মাদ্রাজ গিয়া রেবেকার সহিত পরিণয়াবদ্ধ হন। হিন্দু কলেজে পড়িবার সময় তাঁহার জননী জাহ্নবী দেবী এক পরমাসুন্দরী কন্যার সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থির করেন, কিন্তু মধুসূদন

ইংরাজ মহিলা ভিন্ন বিবাহ করিবেন না বলিয়াই এই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়। এখন এই রেবেকার সহিত বিবাহও কিছুদিন মধ্যেই বিচ্ছেদ হইয়া যায়। রূপের মোহে পতঙ্গের ন্যায় তিনি যে আগুণে ঝাঁপ দেন, তাহার পরিণাম 'আত্মবিলাপে' নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন—

"প্রেমের নিগড় গড়ি, পরিলি চরণে সাধে,
কি ফল লভিলি ?
জলন্ত পাবক শিখা লোভে তুই কাল ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি অবোধ হায় !
না দেখিলি না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে—"

অতঃপরে হেনরিয়েটাকে বিবাহ করেন এবং মাদ্রাজ হইতে স্বদেশ প্রত্যাগত হইয়া অমরকাব্য, নাটক ও প্রহসন লিখিয়া যশের উচ্চশিখরে আরোহণ করেন। অতঃপরে বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াও পয়সার মুখ বড় দেখেন না। এদিকে পঞ্চকোটের চাকুরীও ছাড়িয়া দেন আত্মসম্মান বোধেই। সেই সময়কার দুঃসহ দারিদ্র্যের জ্বালার মধ্যেই "মায়াকানন" রচিত হয়।

নাটকের গল্পভাগ এই—"মায়াকানন" নামে সিন্ধুরাজ্যের এক নির্জ্জন বনানীতে একটী পাষাণময়ী দেবী প্রতিমা আছে। সূর্য্যদেবের কন্যারাশিতে প্রবেশ কালে এই দেবীর পদে শুদ্ধচিত্তে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করিলে পুরুষ আপন ভাবী পত্নীকে আর স্ত্রী আপন ভবিষ্যৎ স্বামীকে সম্মুখে দেখিতে পায়। নাটকের নায়ক অজয় (সিন্ধুদেশের রাজকুমার) এবং নায়িকা ইন্দুমতী (গান্ধারের গদিচ্যুত রাজার কন্যা) এইরূপ আসিয়া পূজা দেন। কিন্তু সিন্ধু রাজবংশের প্রবাদ ছিল, এই বংশের কেহ এইরূপ দেখিলে উভয়েরই অল্পদিন মধ্যে মৃত্যু অনিবার্য্য। হিতৈষী ব্যক্তিগণের চেষ্টায় বিবাহ হইতে পারে না, এবং অজয় ও ইন্দুমতী পরস্পর পরস্পরকে লাভ করিতে না পারিয়া আত্মহত্যায় জীবনলীলা শেষ করে।

মধুসূদন-জননী জাহ্নবী দেবী যে সম্বন্ধ করিয়াছিলেন, আর মধুসূদনের কার্য্যে পিতার অসম্মতি এবং পিতার আত্মার আবির্ভাবের কথা সবই এই নাটকে সংযোজিত আছে।

মৃত্যুর পর আত্মার আবির্ভাবের কথাও আছে। পিতা বলিতেছেন—

'এ দুরন্ত কলিযুগে দেখছি পিতা যদি সর্ব্বতঃ প্রযত্নে পুত্রের শুভানুষ্ঠান করেন তবুও পুত্র তাঁর প্রতিকূল হয়—কালের গতি অতি কুটিল"। আবার মৃত পিতার আত্মা বলিতেছে—"অজয় কুক্ষণে পাপ মায়াকাননে গান্ধার কন্যাকে দর্শন করেছেন।" অন্যত্র বলিতেছেন—

"পাঞ্চালকন্যা নানারূপে ও নানাগুণে ভূষিতা। আমি অজয়ের নিকট প্রসঙ্গ করিলে সে রাগান্ধ হ'য়ে উত্তর দেয় 'পিতা আমার অনুমতি বিনা আপনি এ কর্ম্ম কেন কল্লেন'—"

উপরোক্ত সবই মধুসূদনের জীবনের কথা।

অজয় ইন্দুমতীর রূপমোহে উন্মত্ত, কখনও বলিতেছে—'বেগবতী স্রোতস্বতীর গতি, আর স্বাধীন মনোবৃত্তি রোধকর্ত্তে প্রয়াস পাওয়া অনুচিত'—কখনও বলিতেছে এ কু-জীবন আমি প্রায় স্বপ্নেই কাটালেন, কখনও আক্ষেপ করিতেছে, এ সংসার মায়াময়। জীবন এক স্বপ্ন-স্বরূপ। রাজ পরিচ্ছদ বৃথা।" এ সকল কথাও মধুসূদনেরই।

মধুসূদন কিন্তু উভয়ের প্রাণ বিনাশ করিয়াই নাটক শেষ করেন নাই। সকলে দেখিল মায়াকাননের সম্মুখস্থ প্রস্তরময়ী দেবীমূর্ত্তি শতধা বিদীর্ণ। কুমার কুমারী গন্ধর্ব্বকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু প্রণয়ানুরাগে দুর্ব্বাসা মুনিকে দেখিয়া অভ্যর্থনা না করায় ঋষিশাপে তাঁহারা মানব কুলে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু আজ মৃত্যুতে তাঁহাদের শাপান্ত হয় এবং রাজপুরী ও সন্নিকটস্থ ভারতীয় স্থান অপূর্ব্ব সৌরভে পরিপূর্ণ হয়। 'মায়া কাননে' তাই, আশার কথাও আছে। মধুসূদন

নিজ জীবন কাহিনীও অকাল বিয়োগের কথা বর্ণনা করিলেও তিনি আবার শাপবিমোচনের কথাও বলিয়াছেন। বস্তুতঃ মধুসূদন গন্ধর্ব্ব-কুমারের ন্যায়ই শাপমুক্ত হইয়া সংসারে আসেন, কিন্তু তিনি জানিতেন তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে বাঙ্গলার কাব্য, নাট্যকলা এবং রঙ্গশালা শাপ মুক্ত হইবে, বঙ্গমাতার প্রতিষ্ঠা ও সংস্কৃতি আবার অপূর্ব্ব সৌরভে পূর্ণ হইবে। তাই মায়াকানন মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য মূলক বিয়োগান্ত নাটক হইলেও, বরাবর যে আশায় মধুসূদনের মিল্‌টন প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত কবির সহিত সমানাসনে উপবেশন করিবার আকাঙ্খা ছিল সেই আশাই এখন জাতির হিতকল্পে অনন্ত শান্তিরূপে তাঁহার মহাপথ যাত্রীর সঙ্গী হইয়াছিল।

তাই তিনি শান্তিতে নিদ্রা যাইতেছেন—

"জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি বিরাম,
মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন !"

তাই সমগ্র বঙ্গবাসীগণকেই শ্রদ্ধানত মুখে তাঁহার সমাধির স্থানে আসিয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে তিনি অনুরোধ করিতেছেন—

"দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব
বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল এ সমাধিস্থলে !"

কিন্তু অমর কবির জীবন-নাট্য শেষাবস্থায় আরও বিষাদময় হইয়াছিল। 'মায়া কানন' নাটকের অজয় ও ইন্দুমতীর মৃত্যুতে নিজের ও হেনরিয়েটার চিরনিদ্রার বিয়োগান্ত দৃশ্যের পূর্ব্বগামী ছায়াপাত হইলেও—কবির জীবদ্দায়ই যে সকল মর্ম্মন্তুদ ঘটনা প্রত্যক্ষ ঘটে—মধুসূদন রক্তবমন করিতেছেন, এঘরে হেনরিয়েটা মৃত্যুযন্ত্রণার ছটফট করিতেছে, ও ঘরে পুত্রগণ পর্য্যুষিত অন্নভক্ষণ করিয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতেছে, কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা অন্যত্র স্থানান্তরিত হইয়াছে, নিঃস্ব কপর্দ্দকহীন অবস্থায় হাসপাতালেই মহানিদ্রারত হইতে চলিয়াছেন,

দরিদ্র্যের সমাধিক্ষেত্রে 'পপার' বেরিয়েল-গ্রাউণ্ডে তাহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াসম্পন্ন হইবে—এই সমস্ত জীবদ্দশার বাস্তব বিয়োগান্ত দৃশ্যগুলি বোধহয় কল্পনায়ও তিনি মনের ভিতরে আনিতে পারেন নাই।

কিন্তু এই অবস্থায়ও তাহার শেষ নাটকে কিরূপ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাঁহার একান্ত স্নেহশীল স্বর্গীয় কৈলাশচন্দ্র বসু মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন—*

"...মায়াকানন তাঁহার শেষ সম্পূর্ণ নাটক। গ্রন্থ রচনা কালে তাঁহার লেখনী ধারণে শক্তি না থাকায় আমি তদীয় শয্যাপার্শ্বে বসিয়া 'মায়াকানন' লিখিতাম। মুহুর্মুহু রক্তবমন হইত, রোগের জ্বালা দুঃসহতর হইত, তথাপি নাটক রচনার বিরতি ছিলনা..."

বেঙ্গল থিয়েটারে মায়াকানন অভিনীত হয় ১৮৭৩, ৩০শে আগষ্ট *। অজয়ের ভূমিকা গ্রহণ করেন শরৎ ঘোষ, বেহারীবাবু মন্ত্রী, গোলাপ হন ইন্দুমতী, এলোকেশী হন তপস্বিনী, শ্যামা সাজেন শশীকলা। মায়াকাননের অভিনয় বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয় নাই।

নাটক হিসাবেও ইহার বিশেষত্ব কম। অজয় প্রেমোন্মত্ত, বুদ্ধি বিভ্রংস মন্ত্রী শুভাকাঙ্খী, শশীকলা পিতৃকুল হিতৈষিণী, তপস্বিনী পরোপকারব্রাতা। কিন্তু কোন চরিত্রই পুষ্টিলাভ করে নাই। তবে কপোতাক্ষ নদের ন্যায় সিন্ধুনদকে অজয়রূপী কবি সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"তোমার কলকল ধ্বনি শৈশবে দেব-বীণাধ্বনি স্বরূপ সুমধুর বোধ হ'তো, তুমিও বিদায় কর।"

---

* সোমপ্রকাশ ৩১ ভাদ্র ১২৮১। মৃত মাইকেল ও মায়াকানন কৈলাস বসুর চিঠিখানি নবাবিষ্কৃত। ইতিপূর্ব্বে কেহ উল্লেখ করেন নাই। কৈলাসবাবু আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন—"মায়াকানন অভিনয়ের জন্য কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।"

এই বিষাদ লইয়াই কবিও শেষ কয়টি দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন—

"অতুল দুঃখ সাগরের জলে
দেখিতেছি ক্রমে এ তরী ডুবিল,
অদয়ে।"

মধুসূদন যে ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন তাহা সুনিশ্চিত, তিনি তাই বলিতেন "I am going to rest in my Lord. He will hide me in his best resting place" "আমি মানুষের গড়া গির্জা মানিনা, আমার ঈশ্বর আমায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্রামাগারে আশ্রয় দিবেন।"

মধুসূদনের কথাই সত্য, তাই সার্কুলার রোডের খ্রীষ্টীয়-দিগের সমাধিস্থলও আজ হিন্দুর তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে।

মধুসূদনের গ্রন্থাবলী রচনার তারিখ এইস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল :—
১৮৫৯-শর্ম্মিষ্ঠা, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়শালিকের ঘাড়ে রোঁ, ১৮৬০ পদ্মাবতী নাটক (অমিত্রাক্ষর ছন্দের অংশটুকু বাদে) কৃষ্ণকুমারী নাটক, তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য—

১৮৬১—১৮৬২—মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, আত্মবিলাপ বীরাঙ্গনা কাব্য—

১৮৬৬—পদ্মাবতী নাটকের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অংশটুকু, চতুর্দ্দশ-পদাবলী কবিতাবলী—

১৮৭৩—মায়াকানন*, বিষ কি ধনুর্গুণ। প্রকাশিত হয় ১৮৭৪—

মধুসূদনের প্রহসন দুইটির কথা কিছু বলা হয় নাই। 'একেই

* 'মধুসূদন দত্ত' গ্রন্থে ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে লিখিয়াছেন 'মায়া কানন' ১৮৭৪ এপ্রিল মাসে প্রথম অভিনীত হইয়াছে ইহা ভ্রমাত্মক। নাট্যাচার্য্য অমৃত বসুর স্মৃতিকথা দ্রষ্টব্য—পুরাতন প্রসঙ্গ দ্বিতীয় পর্য্যায় ১৩২, ১৩৩ পৃঃ।

"কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" সম্বন্ধে তিনি যে তারিখ দিয়াছেন তাহাও ভ্রমাত্মক। আর দুঃখের বিষয় ডক্টর সুকুমার সেন তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াই এই সব ভুল তারিখ দিয়াছেন।

কি বলে সভ্যতায়', তদানিন্তন ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে দ্বিতীয়টি 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁা'তে তথাকথিত ধার্ম্মিক ও সম্পত্তিশালী ভণ্ড ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্রটি হুবহু দেওয়া হইয়াছে। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের কয়েকজন যুবক 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার' সভ্য—সভায় বারাঙ্গনার নৃত্যগীত ও সুরাসেবনও বাদ যায় না। প্রধান সভ্য নববাবুর বক্তৃতায়—

"লিবার্টি হল", * স্বাধীনতার দালান, প্রভৃতি কথায় তদানীন্তন রাজনীতি বিশারদ প্রধান ব্যক্তিকেও স্মরণ করাইয়া দেয়। আর নব'র স্ত্রী হরকামিনীর কথায় সমস্ত বিষয়টি উন্মাটিত হয়—

'বেহায়ারা আবার বলে কিযে, আমরা সায়েবের মত সভ্য হয়েছি। হা আমার পোড়া কপাল! মদমাংস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? একেই কি বলে সভ্যতা?'

নিজে নব্যতন্ত্রী এবং বিদ্রোহী হইলেও, 'ইয়ং বেঙ্গলের' নব্যভাব মধুসূদন যেমন ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এরূপ ইতিপূর্ব্বে আর কেহ পারেন নাই।

বাড়ী আসিয়া মত্তভাবশে "Hear, hear, I second the resolution" কথাটিতে গিরিশচন্দ্রও মধুসূদনের বিশেষ প্রশংসাবাদ করেন। কারণ ইহাতে চরিত্রের বিশ্লেষণ খুব মনস্তত্ত্বপূর্ণ হইয়াছে।

অন্য প্রহসনটি আরও জীবন্ত। ভক্তপ্রসাদ ও ফতিমা দুইটি চরিত্রই সরস ও পুষ্ট। ফতির স্বামী হানিফও মন্দ নয়। ফতিমার— 'আমি গরীব হ'লাম ব'লে বয়ে গেলকি, দেখি কোম্পানীর মুলুকে এনসাফ আছে কিনা, বেটা কাফেরকে আমি গোরু খাইয়ে তবে ছাড়বো"—আবার ভক্তপ্রসাদ সম্বন্ধে তাহার কথা—"সে কি কর্ত্তাবাবু, এই মুই আপনার কলজে হচ্ছেলাম, আরো কি কি হচ্ছেলাম, আর

* স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ এক সভায় বক্তৃতাকালে 'লিবার্টি হলের' বাঙ্গলা প্রতিবাদই খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না।

এখন মোরে দূর কর্ত্তে চাও,"—বড়ই তেজস্বিতা ও রহস্যপূর্ণ। হানিফসেখ ভূত হইয়া যে খানসামা গদাকে উত্তম মধ্যম দেয় সেই স্থানটিও বড়ই কৌতুকাবহ। এ কল্পনা অভিনব বটে, কিন্তু অস্বাভবিক নয়। মধুসূদন বস্তুতঃই ভূত বিশ্বাস করিতেন। স্বর্গীয় কেশব সেন সম্পাদিত 'সুলভ সমাচারে' (৮ই শ্রাবণ, ১২৮০) লিখিত হইয়াছে—

"এত লেখাপড়া শিখিয়াও তিনি ভূতকে বড় ভয় করিতেন।"

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র 'সধবার একাদশী'র মত একখানি জীবন্ত রঙ্গরসপূর্ণ নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পান, কিন্তু মধুসূদনের প্রহসন সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করেন*। ইহার কারণ মধুসূদন মদের অপকারিতা দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু কাহাকেও ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন নাই।

মধুসূদনের পরলোক গমনে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বলিয়াছেন—

"দুই সহস্র বৎসর মধ্যে বাঙ্গলার ধর্ম্মোপদেশকগণের মধ্যে শ্রীচৈতন্য দেব আর কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও শ্রীমধুসূদন। কাল প্রসন্ন—ইউরোপ সহায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও আর—তাহাতে নাম লেখ শ্রীমধুসূদন"—

আবার নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রও লেখেন—

বাগেশ্রী-আড়াঠেকা

"কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধুবিনে
মধুহীন রঙ্গভূমি হইয়াছে এতদিনে
কুহকী কল্পনাবলে কে আনিবে রঙ্গস্থলে
কুমারী কৃষ্ণা-কমলে, মোহিতে মনে
বীরমদে অম্বুনাদে কে আনিবে মেঘনাদে
কাঁদিবে প্রমীলাসনে, কেলি বিপিনে·—"

* প্রহসন দুইটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে উচ্চপ্রশংসা করিতেন, তাহা মদ্‌প্রণীত **Indian Stage** এর **Vol. II** তে বাহির হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

৺দীনবন্ধু মিত্র

মধুসূদনের পরেই প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নাম করিতে হয়। দীনবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন ১৮২৯ সালে এবং চিরনিদ্রায় অভিভূত হন ১৮৭৩ সালে। 'নীলদর্পণ' তাঁহার প্রথম নাটক। ইহা ১৮৬০ সালে রচিত। 'নবীন তপস্বিনী' রচিত হয় ১৮৬৩ সালে, আর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' এবং 'সধবার একাদশী' রচিত হয় ১৮৬৬ সালে। 'লীলাবতী' ১৮৬৭, 'জামাই বারিক' ১৮৭২, আর 'কমলে কামিনী' নাটক ১৮৭৩ সালে।

এই সমস্ত নাটকের মধ্যে কয়েকখানিই হাস্যরস প্রধান, লীলাবতী গাম্ভীর্য্যভাব পূর্ণ আর নীলদর্পণ যেমন নিষ্ঠুর কাহিনীর পরিচায়ক, তেমনি মর্ম্মন্তুদ।

দীনবন্ধুর মহাপ্রস্থানের দুইমাস মধ্যেই একখানি মাসিক পত্রিকায় তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি ছত্রে বাহির হয়—

"এই বঙ্গ রঙ্গভূমি উজ্জ্বল করিয়া তুমি
তোমা বিনে আবার আঁধার
দর্পণ করিলে সৃষ্টি দেখাইলে নীল ঋষ্টি
দীনপ্রজা করিলে উদ্ধার
হাস্য রসে অদ্বিতীয়, ছিলে তুমি সর্ব্বপ্রিয়
তার সাক্ষী বিয়ে পাগলা বুড়া
নবীনতপস্বিনীতে দেখাইলে হাসাইলে
হোঁদল কুঁতকুঁতে রসচূড়া।"

বস্তুতঃ দীনবন্ধু যেমন বিয়োগান্ত ঘটনায় কাঁদাইতে পারিতেন, আবার মজলিসে অপূর্ব্বভাবে হাসিরসের ফোয়ারাও ছুটাইতে পারিতেন। ১৮৫৫ সালে তিনি পোষ্ট-ইনস্পেক্টার হন। নানাস্থানে ভ্রমণের জন্য, নানাবিধ চরিত্রবিশিষ্ট মনুষ্যের সংস্পর্শে আসায় তাহার সব কয়টি চরিত্রই রক্ত মাংসের হইয়াছে।*

দীনবন্ধু অতীব পরদুঃখ-কাতর এবং দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন। 'নীল-দর্পণ' সেই সহানুভূতি ও দরদের ফল। যে সময়ে নীলদর্পণ রচিত হয়, নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে বাঙ্গালার কৃষককুল ধ্বংসের পথে চলিয়াছিল, জোর করিয়া প্রজাগণকে দাদন গ্রহণ করিতে হইত। এই পীড়নে 'শ্যামচাঁদ' ও 'রামকান্ত' তাহাদের সহায় হইত। আইন আদালতেও বিশেষ কিছু হইত না, কারণ জজ ম্যাজিষ্ট্রেটদের সহিত ক্লাবে তাহাদের অবাধ মেলামেশা ছিল, একসঙ্গে তাঁহারা নৃত্যামোদে (Ball) যোগদান করিতেন। ইহার উপরে আবার বঙ্গদেশের লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর বাহাদুর স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে নীলকর সাহেবদের জিলায় জিলায় অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট করিবার আদেশ দেন। ক্ষমতালাভে স্বার্থসাধন ও অত্যাচারের আরও সহায়তা হইল। নানা-স্থানে গোলযোগ ও অসন্তোষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক স্বর্গীয় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় খাটিয়া খাটিয়া দেহপাত করিতে লাগিলেন। অতঃপরে পরবর্ত্তী ছোটলাট স্যার জন পীটার গ্রাণ্ট যখন কালীগঙ্গা ও যমুনা প্রভৃতি নদীর উপর দিয়া জলযানে

* কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনের কয়ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে চৌবেড়িয়া গ্রাম দীনবন্ধুর জন্মস্থান। কবিতা রচনায় তিনি ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য ছিলেন। গুপ্তকবির কবিতা ছিল ব্যঙ্গপ্রধান, দীনবন্ধুর হাস্যপ্রধান। দীনবন্ধুর 'সুরধনী কাব্য', 'দ্বাদশ কবিতা' ও 'জামাইষষ্ঠী' প্রভৃতি কবিতায় যথেষ্ট হাস্যরস পাওয়া যায়। দীনবন্ধু হিন্দু কলেজের একজন মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তিনি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের একজন অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন।

মফঃস্বল পরিদর্শন করিতে যান, নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি স্থানের সহস্র সহস্র কৃষক স্ত্রীপুরুষে বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া নিজেদের দুঃখবার্ত্তা জ্ঞাপন করে। প্রজাগণের শান্ত সংহতিপূর্ণ কাতর ভাবে মর্ম্মাহত হইয়া তিনি এই অত্যাচার দমনে বদ্ধ পরিকর হয়েন। তাঁহার আদেশে ১৮৬০ সালে সিভিলিয়ান সিটনকারের সভাপতিত্বে একটি কমিশন বসে এবং কৃষকগণের প্রতি অত্যাচারের বিবরণ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। সমস্ত ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়াই 'নীলদর্পণ' নাটক রচিত হয় এবং ১৮৬০ সালে ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। *

নীলদর্পণই বাঙ্গলাদেশের প্রথম গণ-নাটক। ইহার ফল সম্বন্ধে স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় "জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় উদ্দীপনা" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :

"যখন মানুষের মন এইরূপ উত্তেজিত, তখন দীনবন্ধু নিজের 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশিত করিলেন। নাটকখানি বঙ্গসমাজে কি উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল, তাহা আমরা কখনও ভুলিব না। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আমরা সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলাম। ঘরে ঘরে সেই কথা, বাসাতে বাসাতে

* নীলদর্পণং নাটকং

নীলকর বিষধর দংশনকাতর প্রজানিকর—

ক্ষেমঙ্করেন কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতং।

ঢাকা

শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক কর্তৃক

বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত

শকাব্দা ১৭৮২। ২রা আশ্বিন।

¶ বিস্তারিত আলোচনা Indian Stage দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যাইবে।

তাহার অভিনয়। ভূমিকম্পের ন্যায় বঙ্গদেশের সীমা হইতে সীমা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। এই মহা উদ্দীপনার কাজ স্বরূপ নীলকরের অত্যাচার জন্মের মত বঙ্গদেশ হইতে বিদায় হইল।"

নীলদর্পণের অধিকাংশ ঘটনাই প্রকৃত। গ্রামবাসীর দুর্দ্দশা, সাহায্যকারী মধ্যবিত্তের লাঞ্ছনা তিনিতো নিজচক্ষেই দেখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্বেতাঙ্গ উড এবং রোগও কল্পিত চরিত্র নয়। নদীয়া জেলায় হরমণি নাম্নী একটি রূপবতী চাষার মেয়ে ছিল। জল আনিতে গেলে কচিকাটা কুঠির Archibald Hills* সাহেবের আদেশে পাল্‌কিতে করিয়া তাহাকে আনিয়া দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত হিল্‌সের ঘরে রাখা হয়। কমিশনের কাছে জনৈক পাদ্রি সাহেব এইসম্বন্ধে বিবৃতি দেওয়ায় কমিশনার কৃষ্ণনগরের ম্যাজিষ্ট্রেটকে ঘটনার সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে অনুরোধ করেন। হার্সেল সাহেব ঘটনাটির সত্যতা যথার্থ বলিয়া রিপোর্ট করেন। সিভিলিয়ান ইডেন সাহেব (পরবর্ত্তী ছোটলাট স্যার এস্‌লি ইডেন) সাক্ষ্যে বলিয়াছিলেন বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানীর বড়সাহেব মিঃ লারমূর চাবুকের সহায়তায় চাষাদের সায়েস্তা করিতেন। এই চাবুককে শ্যামচাঁদ বা রামকান্ত বলা হইত। এই মিঃ লারমূর, হিলস্ ও হরমণি, যথাক্রমে নীলদর্পণ নাটকের উড্, রোগ ও ক্ষেত্রমণি, আর হার্সেল সাহেব নবীন মাধবের "অমর নগরের নিরপেক্ষ ম্যাজিষ্ট্রেট"। তাহার সম্বন্ধে তোরাপ বলিতেছে :

"বড় মানুষের ছাওয়াল, নীলমাম্‌দের বাড়ি খাতি যাইতেন না।"

এই নাটকের প্রধান চরিত্র গোলক বসু, তাহার দুই পুত্র

---

* জমির শত্রু নীল
মানুষের শত্রু হিল্

নবীনমাধব ও বিন্দুমাধব, স্ত্রী সাবিত্রী, পুত্রবধুদ্বয় সৈরিন্ধ্রি ও সরলতা, ঐ দাসী আদুরী, প্রজা সাধুচরণ ও তাহার সহোদর রাইচরণ, ঐ স্ত্রী রেবতী, কন্যা ক্ষেত্রমণি, ও প্রতিবেশিনী পদি ময়রাণী।

নীলচাষে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণেরও যে নিষ্কৃতি ছিলনা, সেই বিষয়ে সাধুচরণ গোলক বসুকে বলিতেছে,

"গতবারে আপনার ধান গিয়েছে, এইবারে মান যাবে"

গোলক—মান যাওয়ার আর বাকি কি? পুষ্করিণীর চার পাড়ে চাষ দিয়েছে। এবার নীল কর্ব্বে, তা হ'লেই মেয়েদের পুকুরে যাওয়া বন্ধ হলো। আবার সাহেব বেটা বলেছে যদি পূর্ব্বমাঠের ধানি জমি কয়খানায় নীল না বুনি, তবে নবীন মাধবকে সাতকুঠির জল খাওয়াবে।

নদীয়া জেলার চৌগাছা গ্রামের বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও তাহার ভাই দিগম্বর বিশ্বাস বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া যে প্রজাগণের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা প্রকৃত ঘটনা। নাটকের নবীনমাধব ও বিন্দুমাধব রূপে, ইহারাই শোভা পাইতেছে।

নানা কারণে নাটকখানি সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া উঠিল। শিশু মহলে ছড়া চলিল—

"ময়রাণী লো সই
নীল গেঁজোছো কই?"

কৃষক কাঁদিল—

"বাড়া ভাতে ছাই মোর বাড়া ভাতে ছাই
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষে নেই"

রসজ্ঞ গাহিল—

"ব্যাড়াল চোকো হাঁদা হেমদো
নীল কুটির নীল মেমদো"

বৃদ্ধ হাঁকিল—

"জাত্ মাল্লে পাদ্রী ধরে
ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে"

নীলকরের অত্যাচারও উঠিয়া যায়।

নাটকের ভূমিকার একস্থানে আছে "শ্যামচাঁদ আঘাত উপরে কিঞ্চিৎ টার্পিন তৈল দিলেই যদি ডিস্পেন্সারী করা হয়, তবে তোমাদের প্রত্যেক কুঠিতে ঔষধালয় আছে, বলিতে হইবে।"
অন্যত্র আছে—

"রজতের কি আশ্চর্য্য আকর্ষণ শক্তি! ত্রিংশ-মুদ্রা লোভে অবজ্ঞাস্পদ জুডাস, খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মা যীজাস্‌কে করাল পাইলেট করে অর্পণ করিয়াছিল, সম্পাদক যুগল সহস্র মুদ্রা লাভ পরবশ হইয়া উপায়হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে নিক্ষেপ করিবে আশ্চর্য্য কি?"

নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং উহার ভূমিকা লেখেন রেভারেণ্ড জন লঙ। কিরূপে ইংলিসম্যান ও বেঙ্গল হরকরার সম্পাদকদ্বয় আনীত মাম্‌লায় রেভারেণ্ড লঙ নিগৃহীত হন এবং কারাবরণ করিবার পূর্ব্বে জজ্ সাহেবকে বলেন "আবশ্যক হইলে এরূপ বিবেকানুমোদিত কার্য্য আরও করিব"—সমস্ত ঘটনা 'ইণ্ডিয়ান ষ্টেজের' দ্বিতীয় খণ্ডে থাকায় এখানে পুনরুক্তি করিতে চাই না।

পুত্রশোকে সাবিত্রীর উন্মাদ দশা-প্রাপ্তি, পুত্রবধূর প্রাণনাশ, পুনর্জ্ঞানসঞ্চার, অনুতাপ ও মৃত্যুতে নাটকের শেষ হওয়ায় ইহাকে, বিয়োগান্ত নাটক বলা চলে। এই নাটক এবং মধুসূদনের "কৃষ্ণকুমারী নাটক" প্রায় এক সময়েই লিখিত হয়। একখানা কলিকাতায় আর একখানি ঢাকায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মধুসূদন অগ্রবর্ত্তী নাট্যকার হইলেও, দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নাটকে মধুসূদনের

কোনরূপ প্রভাব লক্ষিত হয় না। নাটকখানি উদ্দেশ্য-মূলক এবং যে উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল, তাহা বিশিষ্টভাবে সার্থক হইয়াছে।

উদ্দেশ্য মূলক নাটকও নাট্যরস, চরিত্রসৃষ্টি এবং ঘটনার সংযোজনায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারে। প্রথম যুগের নাটকে সেই গুণ প্রচুর ভাবে না থাকিলে সেই ত্রুটি গ্রহণ করা উচিত নয়, তবে একথা ঠিক যে "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নাটকের পরে নীলদর্পণে নাট্যসাহিত্য খুবই দ্রুত অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক এই সম্বন্ধে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিই প্রণিধান যোগ্য। তিনি নাটকের সজীবতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"দীনবন্ধুর এই অলৌকিক সমাজজ্ঞতা এবং তীব্র সহানুভূতির ফলে তাঁহার নাটক প্রণয়ন। যে সকল প্রদেশে নীল প্রস্তুত হইত, সে সকল প্রদেশে তিনি অনেক ভ্রমণ করিয়াছিলেন। 'নীলকরের তৎকালিক প্রজাপীড়ন সবিস্তারে স্বক্ষেত্রে অবগত হইয়াছিলেন। এই প্রজাপীড়ন তিনি যেমন জানিয়াছিলেন এমন আর কেহই জানিতেন না। তাহার স্বাভাবিক সহানুভূতির বলে সেই পীড়িত প্রজাদিগের দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে আপনার ভোগ্য দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। 'নীলদর্পণ' বাঙ্গালার Uncle Tom's Cabin "টমকাকার কুটীর"। উক্ত উপন্যাস আমেরিকার কাফ্রিদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে ; 'নীলদর্পণ'ও নীলদাসদিগের দাসত্বমোচনে অনেকটা কাজ করিয়াছে। 'নীলদর্পণে' গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় যোগ দিয়াছিল বলিয়া 'নীলদর্পণ' তাঁহার প্রণীতসকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী। অন্য নাটকের অন্যগুণ থাকিতে পারে, কিন্তু নীলদর্পণের মত শক্তি আর কিছুতেই নাই। তাঁর আর কোন নাটক পাঠককে বা দর্শককে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে নাই।."

"বাঙ্গলা ভাষায় এমন অনেকগুলি নাটক বা নবেল বা অন্যবিধ কাব্য প্রণীত হইয়াছে যাহার উদ্দেশ্য সামাজিক অনিষ্টের সংশোধন।

প্রায়ই সেগুলি কাব্যাংশে নিকৃষ্ট। তাহার কারণ কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি! তাহা ছাড়িয়া সমাজ সংস্করণকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিত্ব নিস্ফল হয়। কিন্তু নীলদর্পণের মুখ্য উদ্দেশ্য এবম্বিধ হইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট। তাহার কারণ এই যে গ্রন্থকারের মহিমময়ী সহানুভূতি সকলই মাধুর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে। ভাষা সম্বন্ধে কেহ কেহ অভিযোগ করেন—তাঁহার ভাষায় প্রাদেশিকতা আছে। কোথাও যে পার্থক্য দেখা যায় তাহা এই দুর্দ্দমনীয়া সহানুভূতিই ইহার কারণ।"

বঙ্কিম বলেন "যাহার সঙ্গে তাঁহার সহানুভূতি, যাঁহার চরিত্র আঁকিতে বসিয়াছেন, তাহার সমুদয় অংশই তাঁহার কলমের আগায় আসিয়া পড়িত। কিছু বাদসাদ্ দিবার তাঁহার শক্তি ছিলনা, কেন না তিনি সহানুভূতির অধীন, সহানুভূতি তাঁহার অধীন নহে। আমরা বলিয়াছি যে তিনি জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্র প্রণয়নে নিযুক্ত হইতেন।

"সেই জীবন্ত আদর্শের সঙ্গে সহানুভূতি হইত বলিয়াই তিনি তাহাকে গড়িতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার উপর আদর্শের এমনই বল যে সেই আদর্শের কোন অংশ ত্যাগ করিতে পারিতেন না। তোরাপের সৃষ্টিকালে তোরাপ যে ভাষায় রাগপ্রকাশ করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না। আদুরীর সৃষ্টি কালে আদুরী যে ভাষায় রহস্য করে তাহা বাদ দিতে পারিতেন না। নিমচাঁদ গড়িবার সময়ে নিমচাঁদ যে ভাষায় মাত্‌লামি করে, তাহা ছাড়িতে পাড়িতেন না। অন্য কবি হইলে সহানুভূতির সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিত—বলিত—'তুমি আমাকে তোরাপের বা আদুরীর বা নিমচাঁদের স্বভাব চরিত্র বুঝাইয়া দাও—কিন্তু ভাষা আমার পছন্দ মত হইবে, ভাষা তোমার কাছে লইবনা'। কিন্তু দীনবন্ধুর সাধ্য ছিলনা যে বলেন যে "না তা হবেনা"। তাই আমরা একটা আস্ত

তোরাপ, আস্ত আদুরী, আস্ত নিমচাঁদ দেখিতে পাই। রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।"

"আমি এমন বলিতেছি না দীনবন্ধু যাহা করিয়াছেন বেশ করিয়াছেন। গ্রন্থে রুচির দোষ না ঘটে, ইহা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, তাহাতে সংশয় কি? আমি যে কয়টা কথা বলিলাম তাহার উদ্দেশ্য প্রশংসা বা নিন্দা নহে। মানুষটা বুঝানই আমার উদ্দেশ্য। দীনবন্ধুর রুচির দোষ তাঁহার ইচ্ছায় ঘটে নাই। তাহার তীব্র সহানুভূতির গুণেই ঘটিয়াছে। গুণেও দোষ জন্মে ইহা সকলেই জানে। কথাটায় আমরা মানুষটা বুঝিতে পারিতেছি। গ্রন্থ ভাল হৌক আর মন্দ হৌক, মানুষটা বড় ভাল বাসিবার মানুষ। তাঁহার জীবনেও তাই দেখিয়াছি। দীনবন্ধুকে যতলোক ভালবাসিত, আর কোন বাঙ্গালীকে যে ততলোক ভাল বাসিয়াছে, এমন আমি কোথাও দেখি নাই বা শুনি নাই। সেই সর্ব্বব্যাপিনী তীব্র সহানুভূতিই তাহার কারণ।"

'নীলদর্পণে' নাট্যকার আদুরীর মুখে বিধবা বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন। একটু স্ত্রী শিক্ষার আভাষও পাওয়া যায়। আদুরীর রহস্যময় কথারও উল্লেখ আছে—

"সৈরিন্ধি—ছোট বউ বসিস্ আমি আস্‌চি। বিদ্যাসাগরের বেতাল শুন্‌বো—

আদুরী—সেই সাগর রাঁড়ের বিয়ে দেয়, ছ্যা! নাকি দুটো দল হয়েছে; মুই আড়াদের দলে।

সর—হ্যাঁ আদুরী, তোর ভাতার তোরে ভাল বাস্‌তো?

আদুরী—ছোট হালদানি সে খ্যাদের কথা আর তুলিস্ নে। মিন্‌সের মুখ খান মনে পড়্‌লি আজো মোর পরাণডা ডুক্‌রে কেঁদে

ওঠে। মোরে বড়ডি ভাল বাস্‌তো। মোরে বাউ দিতি চেয়েলো

পুঁইচে কি এত ভারিরে, প্রাণ, পুঁইচে কি এত ভারি।
মনের মত হলি পরে, বাউ পরাতে পারি॥

ছ্যাখ দিনি খাটে কিনা। মোরে ঘুমুতি দিতনা, ঝিমুলি বল্‌তো "ও পরাণ ঘুমুলে?"

সর—তুই ভাতারের নাম ধরে ডাক্‌তিস্‌।

আহুরী—ছি! ছি! ছি! ভাতার যে গুরুনোক, নাম ধত্তি আছে?

সর—তবে তুই কি কি বলে ডাক্‌তিস্‌?

আহুরী—মুই বল্‌তাম, হ্যাদে এয়ো শুনচো

(সৈরীন্ধ্রীর পুনঃ প্রবেশ

সৈ—আবার পাগলিকে কে খ্যাপালে?

আ—মোর মিন্‌সের কথা শুদুচ্চেন, তাই মুই বল্‌তে নেগেচি।"

'নীলদর্পণ' প্রথমে ঢাকায় অভিনীত হয় এবং পরে হয় কলিকাতায়। ন্যাসনাল থিয়েটার যখন সাধারণ রঙ্গমঞ্চ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে, 'নীলদর্পণ' লইয়াই উহার উদ্বোধন হয়। তারিখ ১৮৭২, ৭ ডিসেম্বর। অভিনয় ভাল হইলেও চরিত্র হিসাবে কোনটিই তেমন পরিপক্কতা লাভ করে নাই।

দীনবন্ধুর দ্বিতীয় নাটক "নবীন তপস্বিনী" প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে। কৃষ্ণনগরে মুদ্রিত হয়। মুদ্রাযন্ত্রটি দীনবন্ধু প্রভৃতি কয়েকজন কৃতবিদ্যের উদ্যোগে স্থাপিত হয়। নাটকখানি সোদর-সদৃশ বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করা হয়।

গল্পটি এই—রাজা রমণী মোহনের নিজ মাতা ও দ্বিতীয়া পত্নীর দুর্ব্ব্যবহারে গর্ভবতী পত্নী প্রমদা তপস্বিনী বেশে সতের বৎসর পুত্রসহ দেশে দেশে পরিভ্রমণ করেন। এরূপে তাহার গর্ভজাত পুত্র বিজয় বিদ্যাভূষণের কন্যার সহিত প্রণয়াবদ্ধ হয় ও অনুতপ্ত

রাজা স্ত্রী পুত্র ফিরাইয়া পান। এই নাটকের বড় রাণী ছোট রাণীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। এই নাটক সম্বন্ধেও সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "প্রকৃত ঘটনা, জীবিত ব্যক্তির চরিত্র, প্রাচীন উপন্যাস ইংরেজি গ্রন্থ এবং প্রচলিত খোসগল্প" হইতে পারাদান করিয়া দীনবন্ধু তাঁহার অপূর্ব্ব চিত্তরঞ্জক নাটক সকলের সৃষ্টি করিতেন। 'নবীনতপস্বিনী'তে ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজা রমণীমোহনের বৃত্তান্ত কতক প্রকৃত। হোঁদল-কুঁৎকুঁতের ব্যাপার প্রাচীন উপন্যাস-মূলক। 'জলধর', 'জগদম্বা' সেক্ষপিয়রের "Morry Wives of Windsor" হইতে নীত। ⌣

বাঙ্গালী পাঠক মধ্যে নিতান্ত অশিক্ষিত অনেক আছেন। তাহারা ভাবিতেন বুঝি দীনবন্ধুর উপন্যাসের মূল প্রাচীন উপন্যাস, ইংরেজী গ্রন্থে বা প্রচলিত গল্পে আছে। তবে আর তাঁহার গ্রন্থের প্রশংসা কি? তাঁহারা ভাবিতেন আমি দীনবন্ধুর অপ্রশংসা করিয়াছি। এ সম্প্রদায়ের পাঠক দিগকে কোন কথা বুঝাইয়া বলিতে আমি অনিচ্ছুক, কেননা জলে আলিপনা সম্ভবেনা। সেক্ষপিয়রে প্রায় এমন নাটক নাই যাহা কোন প্রাচীনতর গ্রন্থমূলক নহে। স্কটের অনেকগুলি উপন্যাস প্রাচীন কথা বা প্রাচীন গ্রন্থমূলক। মহাভারত রামায়ণের অনুকরণ, ইনিদ্ ইলিয়দের অনুকরণে। ইহার মধ্যে কোন গ্রন্থ অপ্রশংসনীয়?

সাধারণতঃ খোশগল্প ভিত্তিতে যে সমস্ত নাটক রচিত হয়, বিশেষ মনোরম হয় না। কিন্তু 'নবীন তপস্বিনী'র প্রত্যেকটি চরিত্র সজীব। রাজা, দ্বিতীয় পণ্ডিত, মাধব, বিদ্যাভূষণ ও বিজয় (ক্ষুদ্রাংশের চরিত্র হইলেও) প্রাণবন্ত। বিশেষতঃ জলধর, জগদম্বা এবং মল্লিকা ও মালতীর গুণে নাটকখানি খুব সরস হইয়াছে। যেমন জলধর তেমনি মল্লিকা। সেক্সপিয়রের ফলষ্টাফের মত জলধর বণিক

রতিকান্তের স্ত্রী মালতীর পেছনে পেছনে ছুটিয়াছিল। কিন্তু মল্লিকার বুদ্ধিতে জলধর স্ত্রী জগদম্বার কাছে নাকাল হয়, আর একদিন হোঁদল কুঁৎকুঁতে পরিণত হয়।

মল্লিকার সরসতায় নাট্যকার ঠিকই তাহার পরিচয় দিয়েছেন "ছুঁড়ি যেন আগুনের ফুল্‌কি, যার চালে পড়্‌বে, তার ভিটেয় ঘুঘু চড়াবে"। তপস্বিনী এবং সুরমার (বিদ্যাভূষণের স্ত্রীর) চরিত্রও বেশ জীবন্ত। এই নাটকে দীনবন্ধু হাসিকান্না সমভাবে প্রকটিত করিয়াছেন। মালতী, মল্লিকা, জলধর, জগদম্বা প্রসঙ্গে যেমন হাসিতে হাসিতে পেট ফুলিবার মত হইয়া যায়, রমণীমোহন ও তপস্বিনীর মিলনে তেমনি পাঠকের চক্ষু স্বতঃই আর্দ্র হইয়া পড়ে। সাহিত্য-সম্রাট ও মল্লিকাচরিত্রের সরসতার খুবই প্রশংসা করিয়াছেন :

"The serious plot is poor enough but the other story is worked out in an irresistibly comic manner. The character of Jaladhar though doubtless taken in part from Shakespeare's Falstaff is life-like and consistent and Mallika with her love of mischief and fun and inexhaustible fertility of resource is Dinobandhu's best female character. Jaladhar's ugly and jealous wife is excellently drawn and tickles the reader's fancy with her firm persuasion that her corpulent old husband is sighed after and inveigled by all young women about the place."

'নবীন তপস্বিনী' সম্বন্ধে রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন—

'নবীন তপস্বিনী'খানি একটী উৎকৃষ্ট নাটক। ইহার কয়েকস্থলে যে কিঞ্চিৎ অসঙ্গত ও অনুচিত ঘটনার বর্ণন আছে—তাহা আমরা আর উল্লেখ করিলাম না। দীনবন্ধুবাবু 'নীলদর্পণে'র পর অনেক দিন পর্য্যন্ত কোন রচনা করেন নাই। এইজন্য অনেকে বলিত

'দীনবন্ধু বাবু তাদৃশ কবি নহেন—'নীলদর্পণ'ও ভাল হয় নাই—কেবল সময়গুণে লোকের আদৃত হইয়াছিল'—'নবীন তপস্বিনী' প্রকাশিত হইবার পর অবধি তাঁহাদের সে মুখ বন্ধ হইয়াছে। এই নাটক কয়েকস্থানে অভিনীতও হইয়াছে।"

'নবীন তপস্বিনী' ন্যাসনাল থিয়েটারে ৪ঠা জানুয়ারী (১৮৭৩) প্রথমে অভিনীত হয়। তখন স্ত্রী চরিত্র পুরুষেরাই অভিনয় করিত। মল্লিকা হইতেন বেলবাবু, বিজয় অমৃতলাল বসু।

ইহার পরে রচিত হয়, 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে আর অল্পদিন পরেই সেই বৎসরে হয় 'সধবার একাদশী'। আর পরের বৎসরেই (১৮৬৭) হয় 'লীলাবতী নাটক'। তিন খানিই সামাজিক অবস্থা অবলম্বনে রচিত। বিয়ে পাগলা বুড়ো রহস্য জনক কাহিনী হইলেও অতি উপাদেয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, ইহা কোন জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লেখা হইয়াছিল। 'লীলাবতী' নাটকে কুকর্ম্ম-রত কুলীন জামাতার হাতে কন্যাদান করিবার আগ্রহ প্রকটিত হইয়াছে। মেয়ের বেশী বয়সে বিবাহ এবং স্ত্রীশিক্ষার কথাও আছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, " 'লীলাবতী' বিশেষ যত্নের সহিত লিখিত এবং দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটক অপেক্ষা ইহাতে দোষ অল্প। এই সময়কে দীনবন্ধুর কবিত্ব-সূর্য্যের মধ্যাহ্ন কাল বলা যাইতে পারে।"

'সধবার একাদশী' অদ্ভুত সামাজিক গল্প। আজকাল যে সমস্ত নাটক দেখা যায়, তাহার তুলনায় ইহাকে একখানি ত্রি-অঙ্ক বিশিষ্ট নাটকও বলা যাইতে পারে। মাইকেল মধুসূদনই প্রথমে দুইখানি অপরাজেয় প্রসহন লিখিয়াছিলেন। দীনবন্ধুর এই দুইখানি তাহারই অনুকরণে লিখিত হয়। কিন্তু 'সধবার একাদশী' মধুসূদনের প্রভাবেই তাঁহার "একেই কি বলে সভ্যতাকে" অতিক্রম করিয়াছে। এ সম্বন্ধে সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয় "পিতা পুত্র" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"পঠদ্দশায় মাইকেলের মেঘনাদ-বিদ্বেষ দেখাইবার জন্ম পুস্তক কিনি নাই বটে, কিন্তু মাইকেলের নাটক প্রহসন সমস্তই পড়িয়াছিলাম। নাটকের ভাষায় বিশেষ কিছু শিখিবার না থাকিলেও, সেই ভাষা সহজ সুমধুর বাঙ্গলা বটে; আর প্রহসনের ভাষা Just appropriate যাহার মুখে যেমন দেওয়া উচিত, তাহার মুখে ঠিক তেমনি দেওয়া আছে,—একথা তখনই লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এই বিষয়ের জন্ম মাইকেলকে শ্রদ্ধা করিতাম। মাইকেলের "একেই কি বলে সভ্যতা" ও "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁা।" অনুকরণে দীনবন্ধু প্রকাশিত করিলেন 'সধবার একাদশী' ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'। শেষোক্ত দুই গ্রন্থ উপরোক্ত দুই গ্রন্থের অনুকরণে বা টক্কর দিয়া লেখা বটে। অনুকরণ অনেক সময় হীনবল হইলেও, সধবার একাদশী নামডাকে 'একেই কি বলে সভ্যতা'কে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। সেও নিমেদত্তের গুণে। নিমেদত্ত আবার মধুদত্ত। সুতরাং মাইকেল মধুসূদন দত্তকে যদি দীনবন্ধু কোন স্থানে ছাপাইয়া থাকেন, সেও মধুসূদন দত্তের কৃপায়। অন্যত্র মধুসূদন একজন গ্রন্থকার; সধবার একাদশীতে মধুদত্ত বা নিমেদত্ত একজন পাত্র বা যুক্তভাবে Dramatis Personie কলিকাতার নর্দ্দমায় পড়িয়া পাহারাওয়ালার লণ্ঠন দেখিয়া নিমচাঁদ Milton আওড়াইয়া বলিতেছে—

"Hail holy light! the off-spring of Heaven first-born, of the eternal Co-eternal beam" ইত্যাদি শুনিয়াছি এ সকল মাইকেল চরিত্রের ঐতিহাসিক ঘটনা। দত্ত কারো ভৃত্য নয়। That's moral courage (বুকে হাত দিয়া) আমি সেই moral courage-এর ছেলে বাবা!" ইত্যাদি অনেক কথা মাইকেলের।

প্রহসনের কথায় প্রহসনের তীব্র সমালোচনার পরে, সমালোচকের দুর্দ্দশার গল্প মনে পড়িল। হুগলী কলেজ হইতে বি, এ দিয়া যখন কলিকাতায় পড়িতাম, তখন রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ফ্রাইডে রিভিউ নাম দিয়া একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সম্পাদিত করিতেন। বিলাতের স্যাটারডে রিভিউতে সাময়িক সাহিত্যের যেমন তীব্র সমালোচনা থাকে, অথবা সেই সময়ে থাকিত, ফ্রাইডে রিভিউতে দে মহাশয় সেইরূপ তীব্র সমালোচনার চেষ্টা করিতেন, সধবার একাদশীর সমালোচনা করিলেন—

"If this trash be ever put on the Stage, we cannot recommend a better place for its performance than Sonagachi and a better audience than its inmates and their patrons."

দীনবন্ধু বাবু অবশ্য তেলে বেগুনে হইয়া জলিয়া উঠিল ; শিখা দেখা দিল "জামাই বারিকের" তোতারাম ভাটে। তোতারাম ভাট অর্থ তোতা বা টিয়া পাখীর মত মুখস্ত করিয়া যে ভাটের মত বলিতে পারে। রেভারেণ্ড লাল বিহারী দে ইংরাজীতে সুবক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাহাকে তোতারাম ভাট নাম দিয়া দীনবন্ধুবাবু গায়ের জ্বালা মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এতদিন পরে এ সকল কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। দীনবন্ধুবাবুর গ্রন্থাবলী প্রকাশের অবসরে ভূমিকায় বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন "তোতারাম ভাট--দীনবন্ধুর কলঙ্ক।" কেন কলঙ্ক? কিরূপে হইল? সেই কথারই টীকা টিপ্পনী করিলাম। তোতারাম ভাটের সমালোচনাটা, মুখস্থ ছিল বলিয়াই, গোড়াগুড়ি বলিতে সাহসী হইলাম।"

মাইকেল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে দীনবন্ধু উত্তর করেন "মধু কি কি কখনও নিম হয়?"

ইহার আখ্যান এই—অটল ধনবান জীবনচন্দ্রের একমাত্র পুত্র। সুরা এবং গণিকা কাঞ্চনে একান্ত আসক্ত হইয়া সাধ্বী স্ত্রী কুমুদিনীকে অবহেলা করে। নাটকের মধ্যে নিমচাঁদই প্রধান চরিত্র। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে কেনারাম ডেপুটি, বাঙ্গাল রামমাণিক্য, ভোলা মাতাল, উকীল নকুলেশ্বর, অটলের পিতা জীবনচন্দ্র, মা, স্ত্রী কুমুদিনী, ভগ্নী সৌদামিনী, পিতৃব্য রামধন, খুড়ো শশুর গোকুলচন্দ্র উল্লেখযোগ্য।

'সধবার একাদশী'তে ইয়ংবেঙ্গলের চিত্রটিই জাজ্জ্বল্যভাবে প্রকটিত হইয়াছে। সুরাপানে সংসারের আশা ভরষা বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রগণ যে কিরূপে অধঃপাতে যাইত, নাট্যকার নিমচাঁদের মুখে তাহা আরোপ করিয়াছেন। মদ্যপায়ী নিমচাঁদ অনুশোচনা করিতেছে—

"রে নিমচাঁদ ; তুমি একবার নয়ন নিমীলন ক'রে ভাব দেখি

তুমি কি ছিলে আর কি হয়েচ। তুমি স্কুল থেকে বেরুলে একটা দেবতা, এখন হয়েচ একটি ভূত, যতদূর অধঃপাতে যেতে হয়, তা গিয়েচ—

"Things at the worst will cease or else
climb upward
To what they were before—"

"হা জগদীশ্বর! (রোদন) আমি কি অপরাধ করেচি, আমাকে অধর্ম্মাকর মদিরা হস্তে নিপাতিত কল্যে? যে পিতা চৈত্রের রৌদ্রে জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে শ্রাবণের বর্ষায়, পৌষের শীতে মুমূর্ষু হইয়া আমার আহরণ করেচেন, সে পিতা এখন আমায় দেখ্‌লে চক্ষু মুদ্রিত করেন; যে জননী আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতেন এবং মুখ চুম্বন করিতে করিতে আপনাকে ধন্যা বিবেচনা করেন সেই জননী এখন আমায় দেখ্‌লে আপনাকে হতভাগিনী ব'লে কপালে করাঘাত করেন। যে শ্বশুর আমাকে দেখ্‌লে তনয়ার বৈধব্য কামনা করেন, শালী শালাজ আমায় দেখলে হাসেন—আমি সকলের ঘৃণাস্পদ আমি জঘন্যতার জলনিধি, আমি আপনার চরিত্রে আপনি কম্পিত হই..."

ইহাতে অনেকে মনে করেন হাসির মধ্যেও Silent Tragedy অন্তর্নিহিত মর্ম্মান্তিক ট্রেজিডি নিহিত। আর রুচি সম্বন্ধে ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১২৭৯ সনের এডুকেসন গেজেটে "নাটক ও নাটকের অভিনয়" সঠিক ধারাবাহিক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"নিমেদত্তকে বর্ণনা করিবার নিমিত্ত যে অশ্লীল কথা ব্যবহার করিতে হইয়াছে, তদ্বিষয়ে রসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন। নিমেদত্ত ইহশরীরে নরকযন্ত্রণা ভোগের আদর্শ স্বরূপ। পাপীব্যক্তি কি প্রকার নরক-যাতনা ভোগ করে, তাহা দেখাইতে হইলে কাজেই নরকোচিত উপকরণের আবশ্যক হয়"।

নিমচাঁদ ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া সৃষ্ট হইলেও উহা তদানীন্তন সময়ের একটী Type চরিত্র। ঐ সময়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণও মদ সেবন করিতেন। স্বদেশ হিতৈষী বাগ্মী প্রবর রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের নাম কে না শুনিয়াছে? তাঁহার এক সুশিক্ষিত ভাগিনেয় মদ খাইতেন না বলিয়া নাকি তিনি বলিতেন "তুই মদখেতে শিখ্‌লিনে, আমি তোকে দশজনের সাম্‌নে বার ক'রবো কি ক'রে?" এইরূপ উক্তিরই প্রতিধ্বনি নিমচাঁদ করিতেছেন—

"বাঞ্চৎ কালেজের নাম ডুবুলে, মদখেতে চায়না"। অন্যত্র চলিতেছে "Wine is the fountain of thought and the more we drink, the more we think." বাবা, যদি Shine, শাইন কত্তে চাও, তবে মদটা ধর। অনেকে মনে করেন ডেপুটিদের উপর ঘটিরাম এবং রাম মাণিক্য চরিত্রে শ্রেণী বিশেষকে আক্রমণ করা হইয়াছে। সে সময়ে কতিপয় পূর্ব্ববঙ্গের ধনাঢ্য অশিক্ষিত যুবক কলিকাতার সমস্ত ইত্‌রামিগুলি আয়ত্ত করিয়া ফেলিত; এবং অনেকে ডেপুটি বিচারের নামে প্রহসন করিত। দীনবন্ধু এই দুইটি চরিত্রে তাহাদিগকে শোধরাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তারক বিশ্বাস (বঙ্কিমবাবুর বন্ধু দিগম্বর বিশ্বাসের পুত্র) মহাশয় 'ঢাকা রিভিউ'তে লিখিয়াছেন—

"অনেকেই জানেন সধবার একাদশী নিমেদত্ত, কাঞ্চন, অটল বা ঘটিরাম ডেপুটি কে? বিশেষতঃ কাঞ্চন যে স্বর্ণ বাইজী এবং নিমেদত্ত যে মধুসূদন দত্ত, তাহা বোধ হয় কাহারও জানিতে বাকী নাই।"

অন্যত্র লিখিতেছেন "কোন নবীন ডেপুটি শামলা মাথায় দিয় চাপরাসী সঙ্গে করিয়া স্বর্ণবাইজীর সহিত আলাপ পরিচয় করিতে যান। এধৃষ্টতা স্বর্ণ সহ্য করে নাই। সে ছিল দর্পিতা অর্থলালসা সম্পন্না! সে লালসা দুই এক হাজারে মিটিত না। তাই হাকিমটির কদর না করিয়া উত্তম মধ্যম দিয়া বিদায় করিয়াছিল।"

এ বিষয়ে "সধবার একাদশীতে" কাঞ্চন বলিতেছে—

"আমার দাসী জিজ্ঞাসা কল্যে, "কি চাওগা? আরদালি খুড়ো ওম্‌নি গোঁপে চাড়া দিয়ে বল্যেন, "ইনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, এইখানে আজ থাক্‌বেন" ইচ্ছে হাস্‌তে হাস্‌তে শানলার উপর হুঁকোর জল ঢেলে দিলে বাবু ভিজে বাঁদরের মত আস্তে আস্তে উঠে গেলেন"।

কেনা। তুমি কিছু বলনি বুঝি?

কাঞ্চন। আমি কি বলেছিলাম—

কেনা। তুমি জিজ্ঞাসা কল্যে "কত টাকা মাইনে পাও?" আমি বল্লেম দু-শ টাকা। তুমি বল্যে "তোমার মত ডেপুটি আমার কোচম্যান আছে।" তাতেই ত তোমার দাসী আস্‌কারা পেলে—

এই কেনারাম ডেপুটির নাম হয় ঘটিরাম ডেপুটি, কারণ মুচিরাম পড়িতে ঘটিরাম পড়িয়া মাম্‌লা খারিজ করিয়া দিয়াছিলেন, আইন সম্বন্ধে অনেক সময় আরদালিকে জিজ্ঞাসা করিয়া করেন, বাঙ্গলা হইতে ইংরাজি তরজমা করিতে—

"আমি যখন তরজমা করি তিন চারটা ডিকসনারী নিই, আর একটা কথা মতরজ্জমকে জিজ্ঞাস করি—এখানে ব'সে তরজমা কত্তে পারিনে"। আর ঘুষ, মদখাওয়া ও বেশ্যাবাড়ী যাইতে কোন prejudice নাই।

নাটকে ভোলা মাতাল কেবলই বলিতেছে—

"স্যান ইন ল স্যার, ডেড্‌ স্যার, ইয়োর ডটার উইডো স্যার—স্যান ইন ল নট ঈট, ফাদার ইন ল ঈট্—"

ইত্যাদি কথা সম্বন্ধে স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—

"বহুকাল হইল সপ্তমী কি অষ্টমী পূজার রাত্রিতে, দীনবন্ধু, কর্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় (দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা) ও আমি নৈহাটি ষ্টেশন হইতে প্রশস্ত বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়া বাটী আসিতেছিলাম।

ষ্টেশন হইতে প্রায় এক বিঘা পথ অন্তরে রাস্তার পশ্চিম দিকের ড্রেনে একটী ধবল পদার্থ দেখিলাম।…নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম উহা গরু নয় একটা বাবু মাতাল ড্রেনে পড়িয়াছে। আমরা তিনজনে তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া দেখিলাম একটি নবীন যুবা, পরিপাটী বেশ বিন্যাস কিন্তু খানায় পড়িয়া উহা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে তিনি আমাদের তিনজনেরই অপরিচিত। দীনবন্ধুর জিজ্ঞাসায় মাতালবাবু বলিলেন তিনি কলিকাতা হইতে শ্বশুর বাড়ী আসিতেছিলেন। ষ্টেশনের বাবুদের সহিত শুঁড়ীর দোকানে মদ খাইয়া শ্বশুরবাড়ী যাইতে খানায় পড়িয়া।"

সুতরাং এই মাতাল চরিত্রটি দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতাপ্রসূত।

নিমচাঁদের চরিত্র দীনবন্ধু বড় কৌশলে সৃষ্টি করিয়াছেন। মধুসূদনকে উপলক্ষ করিয়া লিখিত, অথচ নাট্যকার মধুসূদনের সম্বন্ধে বলিতেছেন—

অটল। আমি মেঘনাদবধ কিনেচি।

নিম। আমি পড়বো।

অটল। আমার বড় ভাল বোধ হয় না।

নিম। ওর ভ্‌লনন্দ তুমি বুঝবে কি? তুমি পড়েচ দাতাকর্ণ, তোমার বাপ পড়েচে দাশরথী, তোমার ঠাকুরদাদা পড়েচে কাশীদাস, তোমার হাতে মেঘনাদ, কাঠুরের হাতে মাণিক—মাইকেল দাদা বাঙ্গালার মিলটন!

মধুসূদনকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিত অথচ মদ ছাড়া নিমচাঁদের কোন দোষ নাই। অটল যখন গোকুলবাবুর স্ত্রীকে বৈঠকখানায় আনিবার প্রস্তাব করিতেছে, নিমচাঁদ বলে—"একি ভদ্রলোকে প্যারে?"

'I dare do all, that may become a man who dares do more, is none.'

কাঞ্চনের সঙ্গেও তার কোনরূপ অভদ্রতা পরিলক্ষিত হয় না। আবার অটলকে বলিতেছে—

"বাবা, আমি মদ খাই আর যা করি তোকে বারম্বার বলেচি, রাত্রে কখন বাইরে থাকিস নে, আপনার ঘরে গিয়ে শুস্, কারণ কাঞ্চনের সতীত্ব তুমি চৌকী দিয়ে রক্ষা কর্ত্তে চাও, কিন্তু তোমার মেগের সতীত্ব বুঝি বরাৎ দিবে বাবার উপর?" তারপর তার কথা খুব পণ্ডিতের মত। সেক্সসপিয়র মিলটন সে জলের মত আবৃত্তি করে আর ইংরাজীতে জ্ঞান সম্বন্ধে কেনারামকে বলিতেছে—

"আর কলেজে পড়লে ঘটিরাম ডেপুটিও হ'তে পারে, কেবলা হাকিমও হ'তে পারে—বাবা সুকতলার জোরে ঘটিরাম ডেপুটি হয়েছ বিদ্যার জোরে হওনি—তোমার কলেজের একটাও দেখাও দেখি আমার মত ইংরাজী জানে—

"I read English, write English, talk English, speechify in English, think in English, dream in English."

নিমচাঁদ আক্ষেপ করিতেছে অটল প্রভৃতি মূর্খ চরিত্রহীন ব্যক্তির সহিত মিশিলে অর্থাৎ "সভ্যতার সহিত বিদ্যাভাবের উদ্বাহ হ'লে" বিড়ম্বনার সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী; তাই সে প্রতিজ্ঞা করিল "বরং সুরাপান নিবারণী সভায় নাম লেখাতে হয়, সেও স্বীকার, তোর মত অধমাত্মা বানরের সঙ্গে আর আলাপ করবোনা Not even for wine."

কেনারাম, অটল, ভোলাচাঁদ প্রভৃতিকেও নিমচাঁদ এমন মিষ্ট কথা শোনায় যে দীনবন্ধু অপূর্ব্ব কৌশলে একটি মাতাল কিন্তু বিজ্ঞ ও উন্নতমনা করিয়া চরিত্রটি সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং এই ভূমিকার অভিনয় যে সে করিতে পারে না। যেমন চরিত্র অতি কৌশলে রচিত, অভিনয়ও অতি কৌশলে উপযুক্ত ব্যক্তিদ্বারা না হইলেই নাটকের মর্য্যাদা নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু দীনবন্ধু

অভিনয় দেখিয়া অতীব প্রীতিলাভ করিয়া বলিয়াছিলেন "ঠিক আমারই পরিকল্পনা—যেমনটি লিখিতে চাহিয়াছি, ঠিক তেমনটি হইয়াছে।" অভিনয়ান্তে গিরিশচন্দ্রকে তিনি বলেন "নিমচাঁদ যেন তোমার জন্যই লেখা।"

নাটকের মধ্যে নিমচাঁদই অদ্ভুত চরিত্র। মদ্যপায়ী এবং জঘন্যতার জলনিধি হইলেও অন্যায় কাজে তাহার খুবই বিতৃষ্ণা। "আমি কি এমন কাজ কর্ত্তে পারি"? এ তার মুখেই সাজে। ইয়ং বেঙ্গল আবার তখন কয়েকপ্রকারের ছিল। নিমচাঁদের মত সরল, শিক্ষিত এবং স্পষ্টবাদীও ছিল। আবার অটলের মত মুর্খ মদ্যপায়ীও ছিল। তবে মধু যেমন নিম হয় না, তেমনি দীনবন্ধুরও মধুসূদনের মদ্যপানের দিক্‌টা দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল, মহৎ দিক্‌টা নয়। নিমচাঁদ পরগৃহে বাস করেন, আর মধুসূদন নিজগৃহে অবস্থান্তরেও দাতা। মধুসূদন ছিলেন স্ত্রীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত, আর নিমচাঁদ স্ত্রীর প্রসঙ্গেই বলিতেছে—

"Thou strikest a dagger at me."

যাহা হউক নিমচাঁদ মধুসূদনের গুণে খুব সরস চরিত্র হইলেও তাহাকে বাদ দিলে মধুসূদনের প্রহসন "একেই কি বলে সভ্যতা" শ্রেষ্ঠতর হইয়া যায়। ইহার নব, সধবার একাদশীতে অটলরূপে আবির্ভূত, ইহার কালী অপর খানির নিমচাঁদ. কর্ত্তা গিন্নী উভয়েরই এক, এবং পয়োধরীই কাঞ্চন, আর কর্ত্তার বৃন্দাবনে যাওয়ার কথাও উভয় প্রহসনেই আছে। তবে অটল একটা হস্তীমুর্খ স্বর্ণখুড়ে গর্দ্দভ। আর নব শিক্ষিত, সে রক্ষিতার জন্য আত্মহত্যা করিতে যায় না, আর তাহার মজলিস্ উদ্যানে বা বৈঠকখানায় হয় না, হয় জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায়, যেখানে সে লিবার্টি হল্ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেয়। যাহা হউক নিমচাঁদ সরল চিত্ত হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্য-সম্রাট তাহার অকৃত্রিম বন্ধু দীনবন্ধুকে সধবার একাদশীর পুণর্ম্মুদ্রাঙ্কণে

নিষেধ করিলেন, আর মধুসূদনের প্রহসন দুইখানির এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাদ করিলেন কেন? ইহার কারণ অনুধাবন করা কর্ত্তব্য। 'সধবার একাদশীতে' ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রকটিত হওয়ায় উহা যেমন সরস হইয়াছে ও জাজ্বল্যমান প্রতীয়মান হয়, 'একেই কি বলে সভ্যতায়' তাহা নাই। এবং তাহাতে ব্যক্তিগত অপেক্ষা শ্রেণীগত কদাচারই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই জন্যই সাহিত্য সম্রাট সাহিত্যের দিক হইতে মধুসূদনের পুস্তক খানিকেই বিশেষ সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।

আমাদের মতে দোষগুণ বাদ দিলেও সধবার একাদশী নাটকখানি খুবই সরস মনে হয়। সুরাপানের অনিষ্টকারিতা প্রদর্শনই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যমূলক হইলেও এক নিমচাঁদই ইহাকে আজ পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখিয়াছে এবং নাট্যসাহিত্যে বরাবর রাখিবে। সুরাপান নিবারণী সভায় যে প্রকৃত উপকার হইত না, ভিতরে ভিতরে বেশ মদ্যপান চলিত, সে বিষয়েও ইঙ্গিত আছে—

নকুল—সুরাপান নিবারণী সভা কচ্ছে কি?

নিম—creating a concourse of hypocrites.

নকুল—না হে, এ সভায় দেশের অনেক মঙ্গল হয়েছে—মদ খাওয়া অনেক কমেছে—

নিম—প্রকাশ্যরূপে খাওয়া কম্‌ছে, গোপনে খাওয়া বাড়ছে।

নকুল—তুমি মাতাল, এ সভায় কি উপকার হচ্ছে তুমি বুঝবে কি?

নিম—অনেকে অনুরোধে পড়ে প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করেন, কিন্তু মদ দেখলেই এগিয়ে আসে।

সে সময়ে একদল সমালোচক (সোমপ্রকাশই প্রধানতঃ) সধবার একাদশীর সমালোচনা করিয়া বলেন গল্পটি কিছুই নহে—একমাত্র সুরাপানের অনিষ্টকারিতায় প্রহসন হয়, নাটক হয় না।

কিন্তু আমরা এ সমালোচনার সমর্থন করিতে পারিলাম না। সধবার একাদশীর ত্রুটি সত্ত্বেও ইহার সৌন্দর্য্য আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে।

অতি সামান্য ঘটনা লইয়া অত্যুৎকৃষ্ট নাটক যে হইতে পারে, তাহার প্রমাণ প্রসিদ্ধ জার্ম্মান নাট্যকার গেটের ফোষ্ট নাটক (Faust) স্বর্গে ফষ্টের প্রশংসা শুনিয়া ম্যাফিষ্টোফিলিস (Mephistoples) তাহাকে কুচরিত্র করিবার জন্য ঈশ্বরের অনুমতি লয়েন। পরে ফষ্টের সহিত সৌহার্দ্দ করিয়া তাহাকে প্রণয়সুখ ও পিশাচ লোক দর্শন করান। য়ুনানী নাটকের মধ্যে এস্কেলেসের প্রণীত "প্রমোথিয়াস"র মত নাটক প্রকৃতই বিরল কিন্তু ইহার গল্পটি নিতান্তই সামান্য। এসকাইলেসের বিখ্যাত নাটক "সপ্তরাজা"র গল্পও নাই বলিলেও হয়। দুই ভ্রাতার রাজ্য লইয়া বিবাদ এবং পরস্পর পরস্পরের যুদ্ধে আহত হইয়া মরিয়া যায়। সেকসপিয়রের ঐতিহাসিক নাটকেও গল্পের ভাগ খুবই সামান্য। দুই খণ্ডের Henry IV, Henry V, Richard III, Henry VIIIতেও গল্প অতি সামান্য। প্রসিদ্ধ নাটক King Lear এও গল্প অতি সামান্য। দুই মেয়েকে রাজ্য খণ্ডদান—এবং তৃতীয় কন্যাকে কিছু না দেওয়া—এই পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয়তঃ—সধবার একাদশীকে যদি প্রহসনই বলি তাহাতে দীনবন্ধুর কোন অপরাধ হয় নাই। ইহাতে গল্পের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিলে মুখ্য উদ্দেশ্য বিফল হয়। প্রহসন ইংরাজ-সৃষ্ট, স্যামুয়েল কুট ও প্রসিদ্ধ গ্যারিক ইহার স্রষ্টা। প্রহসন মাত্রেই গল্পের বিশেষ অংশ নাই। অতঃপরে উদ্দেশ্যের দিক দিয়া দেখিলে বলিতে হয় অটলের অধঃপাত নিমচাঁদের অনুতাপ প্রভৃতিতে যথেষ্ট শিক্ষা আছে। মাতালেরা একবার মদ্যাশক্ত হইলে যে উহা ছাড়িতে পারে না, নাটকে তাহাও দেখানো হইয়াছে।

'শালা', 'বাঞ্চোৎ', 'শুয়োটা' প্রভৃতি কথায় কেহ কেহ গ্রাম্য

দোষ ধরিতেন। কথাগুলি মার্জ্জিত কম হইলেও এগুলি সহরেও ব্যবহৃত হয়। আর ভাষার সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহার অতিরিক্ত কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

দীনবন্ধু ইতিপূর্ব্বে যে ঢাকায় ছিলেন, সেই অভিজ্ঞতার প্রমাণ সুকেশা, সুনাসা, পক্কবিম্বধারা পীনপয়োধরা, বিপুল-নিতম্বা ষোড়ষী যুবতীর নাকের মধ্যস্থলে নোলক, ধলেশ্বরীর তীরের ভাগ্যধরীর রূপলাবণ্য ব্যাখ্যা, আর রামমাণিক্যের প্রশ্ন "ব্যাতোন?" 'আমাগোর হেয়ালী' ইত্যাদিতে। অতঃপরে প্রহসন লেখকেরা যে পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করেন, দীনবন্ধুই তাহার পথপ্রদর্শক। ইহাও বঙ্কিমচন্দ্রের মনঃপূত ছিল না বলিয়াই মনে হয়। তবে পরিতাপের বিষয়, অন্য লেখকদের লেখায় দীনবন্ধুর কৌতুক আছে, দরদ নাই।

কিন্তু বিয়ে পাগলা বুড়ো—জীবিত ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিত বলিয়া বড় সরস হইয়াছে। রাজীব মুখোপাধ্যায় একজন বিবাহ-উন্মত্ত বৃদ্ধ। তাহার দুই কন্যা রামমণি ও গৌরমণি। দুইজনই বিধবা। পাড়ার সকলেই বুড়োর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল, কারণ দলাদলিতে ও অকারণে সকলকে একঘরে করিতে তার মত সিদ্ধহস্ত কেহই বড় ছিল না। তাই পাড়ার কয়েকটি ছেলে নসীরাম, রতা নাপতে, ভুবনমোহন, গোপাল, কেশব প্রভৃতি রতাকে কনে সাজাইয়া বুড়োকে বিবাহ দেয় এবং বাসরঘরে তাহাকে লইয়া কৌতুক করে। পরে ডোম-জাতীয় বুড়ী পেঁচার মাকে কনের পোষাকে বুড়োর সহিত কনে রূপে পাঠাইয়া দেয়। পেঁচার মা সঙ্গে তাহার শূকরের ছানাটিও লইয়া আসে। এই সম্বন্ধে কথোপকথনটি বড় শ্রুতিমধুর।

পেঁচার মা—···ছুটো পারির মেয়ে বললে পেঁচোর মা তোর স্বপোন ফলেচে, আজ তোর বিয়ে হবে, মুই ছানাডারে বড় ভালবাসি। এডারে সাতে করে গ্যালাম, কত মেয়ে কতি পারিনে, মোরে গয়না

পরালে, এভারে গয়না পরালে পাল্‌কিতে তুলে দেলে বলে দেলে কথা কস্‌নে, মুখ দেখানো হলি কথা কস্‌।

রামমণি—বাবার গায় শূয়রের বাচ্ছা দিলি ক্যান।

পেঁ—তানারা বলে দিয়েলো, শোরের ছানা কোলে দিলি তোরে খুব ভালবাস্‌বে। ভাতার বশ করা কত ওষুদ জানি। শোরের ছানা গায় দেওয়া নতুন শেকলাম।

'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে ফতির জন্য ভূতের আক্রমণই পেঁচার মার শোরের ছানায় পরিণত হয়েছে।

অন্যতম নাটক "লীলাবতীর" আখ্যান এরূপ—

হরবিলাস চট্টোপাধায় নামক কাশীপুরের জনৈক সমৃদ্ধ ব্যক্তি আপনার গুণবতী কন্যা লীলাবতীকে নদেরচাঁদ নামক শ্রীরামপুরের একজন অশিক্ষিত, কদাচারী, চরিত্রহীন কুলীনের সঙ্গে বিবাহ দিতে চান। কিন্তু কন্যা পূর্ব্ব হইতেই তাহার পিতৃ-অন্ন ও প্রসাদে পালিত রূপগুণশালী শিক্ষালোকপ্রাপ্ত ললিতমোহনের প্রতি আকৃষ্ট হন। পিতা ইহাতে মত দেন নাই, কেননা তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্র অরবিন্দ নিরুদ্দিষ্ট থাকায়, ললিতমোহনকে পোষ্যপুত্র স্বরূপে গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন—আর কুলীন জামতাকে কন্যা সম্প্রদান করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। ললিতের বন্ধু সিদ্ধেশ্বর, হরবিলাসের শ্যালক শ্রীনাথ, অরবিন্দের স্ত্রী ক্ষীরোদবাসিনী এবং লীলাবতীর সই (হেমচাঁদের স্ত্রী) সারদাসুন্দরী প্রভৃতি সকলেই ললিতের সহিত লীলাবতীকে বিবাহ দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। কোন ফল হওয়ার সম্ভবনা নাই দেখিয়া ললিত পলাইয়া অরবিন্দের সন্ধানে যায়। অতঃপরে পোষ্যপুত্রের জন্য অপর বালকের খোঁজ হইতে থাকে। অরবিন্দের নিরুদ্দেশের কারণ....ভ্রমক্রমে নিজ স্ত্রী মনে করিয়া চাঁপাকে (হরবিলাসের রক্ষিতা স্ত্রীর কন্যা) আলিঙ্গন করায় প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইয়া নিরুদ্দেশে থাকেন। চাঁপাও

সন্ন্যাসী (যোগজীবনের) বেশে অনেক সময়ে নানা সঙ্কট হইতে অরবিন্দকে উদ্ধার করে এবং পোষ্যপুত্র গৃহীত হইবার পূর্ব্বেই অরবিন্দ সাজিয়া বাড়ীতে উপস্থিত হয়। এদিকে ললিতও অরবিন্দকে ২।৩ দিন মধ্যেই সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসেন। ক্ষীরোদবাসিনী যে এই তিনরাত্রি যোগজীবনের সহিত এক শয্যায় বাস করিয়াছে, ইহা লইয়া অত্যন্ত গোলযোগ হয়। কিন্তু চাঁপা সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিলে গোলযোগের নিবৃত্তি হয়। অতঃপরে ললিতের হাতেই লীলাবতীকে সমর্পণ করা হয়।

নাটকের গল্পটি বেশ সরস ভাবে সাজানো হইয়াছে। শেষ দৃশ্যটি বস্তুতঃই রোমাঞ্চকর। পল্লীগ্রামস্থ তরলমতি জমিদার ভোলানাথ, তাহার বয়াটে অশিক্ষিত ভাগ্নেদ্বয় (হেমচাঁদ ও নদেরচাঁদ), কুলান্ধ হরবিলাস প্রভৃতি সরসভাবে চিত্রিত হইয়াছে। স্ত্রীচরিত্র মধ্যে ক্ষীরোদবাসিনী ও সারদাসুন্দরী মন্দ হয় নাই, তবে লীলাবতীর অঙ্কন চরিত্রের উপযোগী হয় নাই। কিন্তু চাঁপা (যোগজীবন) খুবই সরস এবং জীবন্ত, এবং তাহার বুদ্ধিতেই নাটক মিলনান্ত হইয়াছে। পুরুষচরিত্র মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়াটে নদেরচাঁদ সরস। হেমচাঁদ সিদ্ধেশ্বরের প্রভাবে ভাল হয় বটে, কিন্তু নদেরচাঁদ ভিলেইন না হইলেও যেন রক্তমাংসের একটা ক্রিমিন্যাল। আখ্যানটি শেষ পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দগতিতে অগ্রসর হইয়াছে। তবে হিরোর চরিত্রের অঙ্কনে দীনবন্ধুর সমান শক্তি প্রকটিত হয় নাই—না ললিতের না নবীনতপস্বিনীর বিজয়ের। অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, অপর সকল চরিত্রের কথায় কি মাধুর্য্য ও স্বচ্ছন্দতা রহিয়াছে, আর ললিত ও লীলাবতীর, বিজয় ও কামিনীর দীর্ঘ পয়ার, কখনও বা মাইকেলি ছন্দ শোভিত বক্তৃতা বা কথোপকথন—পদ্যে এত নিরস কেন, গদ্যেই বা ইহাতে এত সাগরী ভাষার প্রাচুর্য্য কেন? ইহার কারণ দীনবন্ধুর রচনায় যে স্বাভাবিক ও সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি এবং সামাজিক

অভিজ্ঞতা স্পষ্ট প্রতীয়মান—নায়ক-নায়িকা চরিত্রাঙ্কনে সেই দুইটিরই অভাব। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র মনস্তত্বের আলোচনা করিয়া বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"লীলাবতী বা কামিনীর শ্রেণীর নায়িকা সম্বন্ধে দীনবন্ধুর কোন অভিজ্ঞতা ছিলনা। কেননা কোন লীলাবতী বা কামিনী বাঙ্গলা সমাজে ছিলনা বা নাই। হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে কোর্টসিপের পাত্রী হইয়া যিনি কোর্টসিপ করিতেছেন তাহাকে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাঙ্গালী সমাজে ছিলনা—কেবল আজি কাল নাকি দুই একটা হইতেছে শুনিতেছি। ইংরেজের ঘরে তেমন মেয়ে আছে, ইংরেজ কন্যাজীবনই তাই। আমাদিগের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও তেমনি আছে। দীনবন্ধু ইংরেজি সংস্কৃত নাটক নবেল ইত্যাদি পড়িয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, বাঙ্গলার কাব্যে বাঙ্গলার সমাজস্থিত নায়ক নায়িকাকেও সেই ছাঁচে ঢালা চাই। কাজেই যাহা নাই, যাহার আদর্শ সমাজে নাই, তাই তিনি গড়িতে বসিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে নাই, কাজেই সেই সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতিও সেখানে নাই। কাজেই এখানে তাহার কবিত্ব নিষ্ফল।

"আবার যেখানে দীনবন্ধুর প্রধান নায়িকা কোর্টসিপের পাত্রী নহে—যেমন সৈরিন্ধ্রি—সেখানেও দীনবন্ধু জীবন্ত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া পুস্তকগত আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন, কাজেই সেখানেও নায়িকার চরিত্র স্বাভাবিক হইতে পায় নাই।"

লীলাবতীর দীর্ঘ কবিতা সম্বন্ধে পণ্ডিত রামগতিন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন "দীনবন্ধু ইহাতে দীর্ঘ দীর্ঘ মাইকেলী ছন্দ নিক্ষেপ করিয়াছেন।" দীর্ঘ কবিতা শ্রুতিকটু বটে, কিন্তু এখানে নাটকের 'টেক্‌নিক' সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। মধুসূদন নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তনের কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শর্ম্মিষ্ঠা ও কৃষ্ণকুমারী নাটকে কোন

কবিতা নাই। পদ্মাবতীতে কলির মুখে যে কবিতা আরোপিত হইয়াছে, তাহা অভিনয়ের সময়ে রচিত এবং তাহার পূর্ব্বেই দীনবন্ধুর নবীন-তপস্বিনী ও লীলাবতী রচিত হয়। সুতরাং দীনবন্ধু রচিত মাইকেলি ছন্দের কবিতা মধুসূদনের গুণসম্পন্ন না হইলেও নাটকে প্রথমে দীনবন্ধুই ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে তারাচরণ শিকদার এবং রামনারায়ণ তর্করত্ন যে ব্যবহার করেন, তাহা পয়ার বা ত্রিপদী। দীনবন্ধুর কবিতা ইহাপেক্ষা উচ্চাঙ্গের, তবে পড়িবার ক্ষমতা থাকা চাই। যাহা হউক এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

দীনবন্ধুর অন্যতম প্রহসন জামাই বারিক রচিত হয় ১৮৭২ সালে। চারি অঙ্ক বিশিষ্ট। বিজয় বল্লভ কায়স্থ জমিদার। কয়েকজন কুলীন জামাতাকে ঘরজামাই করিয়া তাহাদের বাসের জন্য একটি পৃথক বারিক করিয়া দিয়াছিলেন। ইহারা গাঁজা গুলি খাইত এবং 'পাশ' আসিলে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিবার অনুমতি পাইত। কামিনী নাম্নী এক মেয়ে অন্যতম ঘরজামাই তাহার স্বামী অভয়কুমারকে পদাঘাত করিবে বলিয়াছিল। অভিমানে অভয় পদ্মলোচনের সঙ্গে বৃন্দাবন গিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করে। কামিনীও অনুতপ্ত হইয়া স্বামীর অন্বেষণে বৃন্দাবনে গিয়া বৈষ্ণবী সাজিয়া কৌশলে অভয়ের সঙ্গে কণ্ঠী বদল করেন। পরে পরিচয় হয়।

পদ্মলোচনটি একটি জীবন্ত চরিত্র—স্পষ্টবাদী বুদ্ধিমান, কিন্তু দুই স্ত্রীর পাল্লায় অতিষ্ঠ হইয়া সেও অভয়কুমারের সহযাত্রী হইয়া বৃন্দাবনে যায়। পদ্মলোচনে রামনারায়ণের 'নবনাটকের' গবেশচন্দ্রের ছায়া রহিয়াছে। তথাপি প্রহসনখানি নবনাটককেও হার মানাইয়াছে। এখনও মাঝে মাঝে পদ্মলোচন ও তাহার স্ত্রীদ্বয়ের প্রসঙ্গঘটিত দৃশ্য দুইটি অভিনীত হয়। ভবী ময়রানী, হাবার মা, পাঁচি, কামিনী, বগলা বিন্দুবাসিনী সবচিত্রই রসসৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে।

জামাই বারিকের যে একটি ইতিহাস আছে তাহা অক্ষয়চন্দ্র

সরকারের ভাষায় ৮১ পৃঃ বিবৃত করিয়াছি। 'সধবার একাদশী'কে কদর্য্যাস্থানোপযোগী বলিয়া রেভারেণ্ড লালবিহারী দে সমালোচনা করেন। ভোতারাম ভাঁট রূপে এই নাটকে দীনবন্ধু তাহাকে চিত্রিত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "ভোঁতারাম ভাট" দীনবন্ধুর চরিত্রে ক্ষুদ্র কলঙ্ক। চিত্রটি এই—

পঞ্চম জামাতা—পাঁচি তোর পতন হয়েছে।

পাঁচি—কোথায় ?

প্রথম জামাতা—কুয়োর ভিতর।

পঞ্চম জামাতা—ঠাট্টা কোরোনা, বাবা, আমার দাদা রিফিউট লেখেন

প্রথম—তাঁর নাম কি ?

পঞ্চম জামাতা—ভোঁতারাম ভাট—

প্রথম জামাতা—যিনি বৈষ্ণব ছিলেন, তারপর কলমা কেটে কাজি হয়েচেন ?

পঞ্চম জামাতা—ভোঁতারাম ভাটকে বড় সাধারণ লোক জ্ঞান কোরো না ; তাঁর রিফিউটএর ভারি ধার—

দীনবন্ধু ক্ষমতা প্রদর্শন পটু ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবুদের উপরে বড় খড়্গ হস্ত ছিলেন। পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন একবার বঙ্কিমচন্দ্রের মজলিসে একজন ডেপুটিবাবু নিজের গুণগরিমার খুব ব্যাখ্যা করিয়া দেড়বৎসর মধ্যে কিরূপে তিনবৎসরের কার্য্য শেষ করিয়াছিলেন ব্যাখ্যা করায় দীনবন্ধু তখনি উত্তর দেন—

"ওহে বুঝেছি তুমিই বুঝি ত্রেতাযুগে সমুদ্র পার হ'য়ে লঙ্কা দগ্ধ করেছিলে ?"

"সধবার একাদশী"তে কেনারামের পরিচয়ে সেই অবধি বোকা ও গর্ব্বিত ডেপুটিরা নটিরাম ডেপুটি নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। "জামাই বারিকে" পদ্মলোচনে মুখেও এরূপ ব্যঙ্গ করিয়াছেন।

ভা, ব—ডেপুটিবাবু কোথায় কর্ম্ম করেন ?

পদ্মলোচন—কিস্কেন্দাবাদে

ঘটক—বিচারে কেমন ?

পদ্ম—ছয় কেটে ছুই—

ঘটক—সে কি মহাশয় ?

পদ্ম—ডেপুটি বাবু একদিন একজন আসামীকে ছয়মাস মেয়াদ দিলেন। বাসায় এসে সেরেস্তাদার মহাশয়ের কাছে জানলেন এমন অপরাধে ছুই মাসের অধিক মেয়াদ হয় না, পরদিন কাছারি এসে ছয়কেটে ছুই কল্লেন।

ঘটক—ডেপুটিবাবু কি সেরেস্তাদারের বশীভূত ?

পদ্ম—সেরেস্তাদার ডেপুটি বাবুর ব্ল্যাক্‌ষ্টোন।

ঘটক—কলমের জোর কেমন ?

পদ্ম—প্রায় বকলমে কাজ চলে।

ঘটক—রিপোর্ট লিখিতে হলে কি করেন ?

পদ্ম—কাগজ বগলে করে বন্ধুগণের শরণ লন।

ঘটক—ডেপুটিবাবু নাকি বড় রসিক ?

পদ্ম—রেপ্‌কেস গুলিন বাবুর একচেটে। মেয়ে সাক্ষীদের জবানবন্দী হয় বাসায় ব'সে।

ঘটক—ডেপুটি বাবু সভা কেমন ?

পদ্ম—সভাভার মধ্যে দেখতে পাই যুবরাজের মত বৈঠকখানায় ঠ্যাং উঁচু করে লাঙ্গুলপাকান-উচ্চ গদিতে বসে থাকেন। ভদ্রলোক এসে বিরক্ত হয়ে উঠে যায়।

ঘটক—বোধ হয়, বাবুজি মানের গৌরবে যুবরাজ অঙ্গদের মত ব্যবহার করেন।

পদ্ম—মানত মানকচু, বন্য শূকরের দন্তে বিদারিত বাবুর মান গুঁতোয় গুঁতোয় থোঁতো হয়ে গেছে।

চপ—কিসের গুঁতো ?

পদ্ম—একের নম্বর গুতোঁ মেজেষ্টরের, দুয়ের নম্বর গুঁতো সেসান জজের, তিনের নম্বর গুঁতো হাইকোর্টে, চারের নম্বর গুঁতো গবর্ণমেণ্টের, পাঁচের নম্বর গুঁতো বেনামী দরখাস্তের। গুঁতাং পঞ্চ উপর্য্যুপরি—

ঘটক—বোধকরি সেই জন্যে। বাসায় এসে উচ্চ গদিতে আড় হয়ে পড়েন, ভদ্রলোক এলে গাত্রবেদনায় উঠতে পারেন না।

প—সে জন্য নয়

ঘ—তবে কেন গদি ছেড়ে উঠেন না?

প—পাছে লাঙ্গুল বেরিয়ে পড়ে।

দীনবন্ধু বড় রসিক এবং ব্যঙ্গপ্রিয় ছিলেন। তিনি কথোপকথনে যেমন সুরসিক ছিলেন তেমনি লোককে হাসাইতেও পারিতেন। তাঁহার সঙ্গে কথা বলিলে লোক না হাসিয়া পারিত না। তাহার বিষাদ দূর হইত। এবং সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :

"তাহার প্রণীত গ্রন্থ সকল বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট, হাস্যরসের গ্রন্থসকল বাঙ্গলা ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হাস্যরসের গ্রন্থ বটে কিন্তু তাঁহার প্রকৃত হাস্যরসপটুতার শতাংশের পরিচয় তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় না। হাস্যরসের অবতারণায় তাঁহার যে পটুতা তাহার প্রকৃত পরিচয় তাহার কথোপকথনেই পাওয়া যাইত ; অনেক সময় তাঁহাকে মুর্ত্তিমান হাস্যরস বলিয়া বোধ হইত। দেখা গিয়াছে যে অনেকে "আর হাসিতে পারিব না" বলিয়া তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে। হাস্যরসে তিনি প্রকৃত ঐন্দ্রজালিক ছিলেন।

"দীনবন্ধু যেখানে না গিয়াছেন বাঙ্গালায় এমত স্থান অল্পই আছে। যেখানে গিয়াছেন সেইখানেই বন্ধুসংগ্রহ করিয়াছেন। যে তাঁহার আগমন বার্ত্তা শুনিত সেই তাহার সহিত আলাপের জন্য

উৎসুক হইত। যে আলাপ করিত সেই তাহার বন্ধু হইত। তাহার ন্যায় সুরসিক লোক বঙ্গভূমে এখন আর কেহ আছে কিনা বলিতে পারি না। তিনি যে সভায় বসিতেন সেই সভার জীবনস্বরূপ হইতেন। তাহার সরস সুমিষ্ট কথোপকথনে সকলেই মুগ্ধ হইত। শ্রোতৃবর্গ মর্ম্মের দুঃখ সকল ভুলিয়া গিয়া তাঁহার সৃষ্ট হাস্যরস-সাগরে ভাসিত।"

নবীন সেন মহাশয়ও লিখিয়াছেন—

"তাহার কাছে আধঘণ্টা বসিলে পার্শ্বব্যথা উপস্থিত হইত। তাঁহার কথা শুনিয়া লোকে হাসিয়া গড়াগড়ি দিত, কিন্তু তিনি নিজে কদাচিত হাসিতেন"।

দীনবন্ধু যেমন বাক্‌পটু এবং রসজ্ঞ ছিলেন তাঁহার রচনাও সেইরূপ রসের ভাণ্ডারে পূর্ণ থাকিত। তাহার প্রভাবে আসিয়া হাসিতে হাসিতে লোক নিজের ত্রুটি বা অসভ্যতায় লজ্জিত হইত। দোষ শোধরাইতে বিশেষতঃ ডেপুটি বাবুদের উপর তিনি সমধিক খড়্গহস্ত ছিলেন। এবিষয়ে স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন :

"দীনবন্ধু বা বঙ্কিম উভয়েই কোন মজলিসে উপস্থিত হইলে আফিসের বা সাহেব সুবার কথা বলিতে ভাল বাসিতেন না। কিন্তু দেখা যাইত যে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মাত্রেই মজলিসে বসিলে সাহেবের কাজকর্ম্মের কথা ও আফিসের কাজকর্ম্মের কথা না কহিয়া সোয়াস্তি পাইতেন না। কিন্তু উভয়ের কথা ও ব্যবহারে বিশেষতঃ দীনবন্ধুর শ্লেষোক্তিতে উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া যাইতেন।"

দীনবন্ধুর কবিত্বের সামান্য প্রশংসা করিলাম, কিন্তু একটি কথা বলা হয় নাই। তাঁহার নাটক মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের উপলক্ষে লিখিত বলিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভিনেতাগণ সধবার একাদশী, বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো, লীলাবতী, নীলদর্পণ লইয়াই অভিনয় আরম্ভ করেন। এই

নাটকগুলি ন্যাসনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে বলিয়াই মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ দীনবন্ধুকে "Father of the Bengali Stage" বলিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন।

দীনবন্ধুর শেষনাট্য রচনা 'কমলে কামিনী' নাটক। (১৮৭৩ সালে)। ইহার আখ্যানভাগের সহিত নবীন তপস্বিনীর কতকটা মিল আছে। মণিপুর রাজার দুই মহিষী, প্রথমার গর্ভজাত পুত্র দ্বিতীয়ার ঈর্ষায় অপহৃত হয় এবং পুত্রশোকে তাহার মৃত্যু হয়। ছেলেটিকে মণিপুরের এক মহিলা কুড়াইয়া আনিয়া মানুষ করে; ক্রমে সে রাজ্যের সেনাপতির স্নেহলাভে সমর্থ হইয়া তাহার সহকারী হয়। এই সময়ে কাছাড়ের সিংহাসন কাহার অধিকারে যাইবে, এই লইয়া মণিপুর রাজার সহিত ব্রহ্মের রাজার বিবাদ হয় এবং সহকারী সেনাপতি শিখণ্ডিবাহন নামে যিনি পরিচিত—যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ব্রহ্মরাজ সেনাপতিকে বন্দী করিয়া আনে। এদিকে ব্রহ্মরাজকন্যা রণ-কল্যাণী ও শিখণ্ডিবাহনের মধ্যে ভালবাসা জন্মে। তাহাদের প্রথমে সাক্ষাৎ হয় কাছাড়ের রাসলীলার সময়ে, পরে হয় ব্রহ্মরাজ শিবিরে। ব্রহ্মরাজ প্রথমে আপত্তি করিলেও পরে বিবাহে সম্মতি দেন। এদিকে অনুতপ্তা বিমাতার মুখের সব কথা প্রকাশ হইলে পিতা-পুত্রের মিলন হয় এবং কল্যাণ-কুমারীও মণিপুর রাজপুরবধূরূপে গৃহীত হয়। নাট্যকার বোধহয় শিখণ্ডিবাহনকে সেক্সপিয়রের ম্যাকবেথ ও ব্যাঙ্কোর সঙ্গে তুলনা করিয়া ভীষণ যুদ্ধের ভীষণতার একটা ছবি দিয়াছেন—

Duncan—Dismay'd not this our captains, Macbeth and Banquo?

Sarjeant—Yes: As sparrows eagles, or hare the lion.

মধুসূদন ও দীনবন্ধুর পরে আর একজন নাট্যকারের নাম করিতে

হয়। ইনি কবিগুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অন্যতম শিষ্য মনোমোহন বসু ; জন্ম ১৮৩১-১৯১২। ইনি 'মধ্যস্থ' কাগজের সম্পাদক ছিলেন। ইনি কয়েকখানি পৌরাণিক ও সামাজিক নাটক প্রণয়ন করেন, যথা—

(১) রামাভিষেক নাটক। হিন্দুর রামায়ণ অবলম্বনে ইহাই প্রথম পৌরাণিক নাটক। ইহার রচনাকাল ১৮৬৭। পরের বৎসরেই বহুবাজার নাট্যসমাজ কর্তৃক অভিনীত হয়। নাটকখানি অভিনয়ের পক্ষে সোজা হয় বলিয়া ইহাকে সেই সময়ে লোকে বর্ণপরিচয় নাটকও বলিত। কলিকাতা পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই ঢাকায় কতিপয় যুবক রামাভিষেক নাটক অভিনয় করিয়া গরীবদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ করেন।

কোথায় রাম রাজা হইবেন, আজ কোথায় তিনি বনগমন করিলেন, রামায়ণের অযোধ্যাপর্ব্বের এই অংশটি খুব করুণাত্মক। বিশেষতঃ কৌশল্যার শোক ও দশরথের পুত্রশোকও তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ ইত্যাদি মর্ম্মান্তিক ঘটনাপূর্ণ থাকায় নাটকে কারুণ্যরস উদ্ভূত হইয়াছে। চাষাদের মুখে পূর্ব্ববঙ্গের কথা দেওয়া অশোভন হইয়াছে। এক মধুসূদন ও গিরিশচন্দ্র ছাড়া নাট্যকারগণ এই লোভ ছাড়িতে পারেন নাই। ইহাতে হাস্যরসের সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু নাটকীয় রস ভঙ্গ হয়।

(২) প্রণয় পরীক্ষা নাটক—১৮৬৯ রচিত পঞ্চাঙ্ক নাটক।

ইহার চরিত্রাদি শাম্ভবাবু, তাহার ভগ্নী সুশীলা দুই স্ত্রী মহামায়া ও সরলা, সরলার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী তরলা প্রভৃতি চরিত্রের অবতারণা করিয়া দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে। বড় স্ত্রী মহামায়া দাসী কজ্জলার সহায়তায় বহুবিবাহের ছোট স্ত্রীকে অসতী প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ব্যর্থ হয়। প্রণয় পরীক্ষায় সরলা উত্তীর্ণ হন।* পূর্ব্বেই স্বামীকে ঔষধ

* সরলার স্বামীর কাছে লিখিত পত্র যেন স্বামীবন্ধু সদানন্দবাবুর কাছে লিখিত বলিয়া মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য মহামায়া সদানন্দ বাবুর নাম খামে লিখিয়া এমনভাবে চিঠিখানি রাখিয়া দেয় যেন উহা স্বামীর হাতে পড়ে।

খাওয়াইতে মহামায়া ত্রুটি করে নাই। নাটক বিশেষত্বহীন, গল্পও বিশেষ মনঃপূত হয় না। সরলাকে সাধ্বী বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। শান্তবাবুর ভগ্নীপতি নটবর দীনবন্ধুর নদেরচাঁদের মতই অশিক্ষিত ও নেশাখোর। তবে নাটকীয় চরিত্রগুলির সৃষ্টি দীনবন্ধুর চরিত্র হইতে অনেকটা নীরস। ইহার পূর্ব্বে বহু বিবাহ লইয়া রামনারায়ণের নব-নাটক রচিত হইয়াছে। মনোমোহন সরলাকে শিক্ষিতা করিলেও নবনাটকের সজীবতা অনেক বেশী।

(৩) সতীনাটক—

প্রজাপতি দক্ষসুতা সতী পতিনিন্দা শুনিয়া যে দেহত্যাগ করেন, সেই কাহিনী অবলম্বনে এই নাটক রচিত। নাটকখানি পঞ্চাঙ্ক—১৮৭৩ সালে রচিত।

নাটকে সতী চরিত্রই বিশেষ উল্লেখনীয়। সতীর পতিভক্তি ও বিবাহ-জীবনের শান্তি বেশ ফুটিয়াছে, তবে সতী, দক্ষ ও প্রসূতির বক্তৃতা অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়াছে। চন্দ্রের পত্নী দক্ষের অন্যতমা কন্যা অশ্বিনী, অশ্লেষা ও মঘার কথায় বেশ সরসতা আছে। মঘার কথাগুলি বেশ কৌতুকপূর্ণ, অশ্লেষারও মন্দ নয়। শান্তিরাম চরিত্রটি বেশ অঙ্কিত হইয়াছে। মদখোর নিমচাঁদ, ও গাঁজাখোর সাতুলালের (নয়শো রুপেয়া) ন্যায় তার কথাগুলিও বেশ সরস, তবে তাহাতে প্রচ্ছন্ন ভক্তি মিশ্রিত থাকার উপাদেয় ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে।

মঙ্গলময় মহাদেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"শান্তিরাম! তুমি কি চাও? যা চাবে তাই পাবে।"

শান্তি—সেইটাই চাই—

শিব—কি বল?

শান্তি—ভজন পূজন সাধন বিনা
আমার গাঁজা ভিজবে কিনা?

—বেশ তথাস্তু।

শান্তি—(নৃত্য পূর্ব্বক) শান্তিরাম তুই বগল বাজা
গোলোকে ভিজেছে গাঁজা
যম রাজাকে দেখা মজা ।

এই স্থানটি বেশ কৌতুকাবহ। তবে তখনকার দিনে শান্তিরামের অঙ্গ-ভঙ্গিসহ প্রলাপোক্তি কৌতুক দায়ক হইলেও, পরবর্ত্তী যুগে গিরিশচন্দ্রের "জনার" প্রচ্ছন্ন ভক্তিই উন্নত রুচিসম্মত যথার্থ ভক্তিমূলক বিধায় শিক্ষিত সমাজেও জনপ্রিয় হইয়া উঠে।

সতী নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণে একটী ক্রোড়-অঙ্ক সংযোজিত হইয়াছে। সতীর দেহত্যাগজনিত বিয়োগান্ত দৃশ্যে নাটকের সমাপ্তি ভক্তজনগণের মনঃপূত হয় নাই বলিয়া দ্বিতীয় সংস্করণে (১১৮৪) হরপার্ব্বতী মিলন সংযোজিত হইয়াছে। শিব সতীকে বলিতেছেন—

"এবার তুই দেহে আর রবনা। এস, অর্দ্ধাঙ্গি ভাবে দুজনে এক হই।"

আর হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য শান্তিরামের মুখে অনেক কথা আরোপিত হইয়াছে। নাট্যকার বিজ্ঞপ্তিতে লিখিয়াছেন—

"বিয়োগান্ত-নাটক-প্রিয় মহাশয়েরা সে অংশটি বর্জ্জন এবং পুনর্মিলনানুরাগী মহাশয়েরা গ্রহণ পূর্ব্বক অভিনয় করিতে পারেন।"

গিরিশচন্দ্রের জনা প্রভৃতি নাটকেও এরূপ দৃশ্যের অবতারণা আছে, তবে সতীর অতিরিক্ত অঙ্কটীর মত এত কথা নাই।

(৪) হরিশ্চন্দ্র নাটক—

এই নাটকখানি দশম শতাব্দিতে রচিত ক্ষেমিশ্বরের সংস্কৃত চণ্ডকৌশিক নাটকাবলম্বনে রচিত। অবশ্য অনুমান ১৮৬৯ সালে একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কর্তৃক ইহা বাঙলা ভাষায় অনূদিত হয়, আর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে 'হরিশ্চন্দ্র চরিত নাটক' নামে আরেকখানি নাটক রচিত হয়। মনোমোহনের হরিশ্চন্দ্র নাটকে দাতা হরিশ্চন্দ্র

এবং রাণী শৈব্যার আখ্যান বর্ণনে বেশ করুণ রসের সঞ্চার হইয়াছে। নাট্যকার বিশ্বামিত্রের শিষ্য পাতঞ্জলকে সরস করিয়াছেন। পাতঞ্জল, খগেন্দ্র, নাগেশ্বর, কমলা, মল্লিকা প্রভৃতি নূতন সৃষ্টি। নাগেশ্বরকে হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যদানে নূতনত্ব হইয়াছে কিন্তু বিশ্বামিত্র কিঞ্চিত খর্ব্ব হইয়াছে। খগেন্দ্রকে প্রথমে একটু পাগলের মত দেখানো হইয়াছে, পরে তিনি বীরপুরুষে পরিণত হইয়াছেন।

নাটকের গান—

"দিনের দিন সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন

অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, অপমানে তনু ক্ষীণ" ইত্যাদি এখনও মর্ম্মস্পর্শী মনে হয়।

এই গানটির মত আর দুই একটী আছে। ভাষাও ঈশ্বর গুপ্তের মতই সরস, যেমন—

দে কর, দে কর, রব নিরন্তর—
    করের দায় অঙ্গ জরজর!
সিন্ধু-বারি যথা শুষে দিনকর,
    শোণিত শোষণ করে শতকর,
কর-দানে নর নিকর কাতর,
    রাজা যেন হয় বৈশ্বানর।

'সতী' এবং 'হরিশ্চন্দ্র' বোবাজার এমেচিয়ার থিয়েটারে অভিনীত হয়।* এই দুইটি অভিনয় যাত্রার আসরেও বেশ জমে, এবং তাহা পূরামাত্রায় গীতাধিক্য বশতঃ। হরিশ্চন্দ্র এবং সতী কোন সাধারণ থিয়েটারে অভিনীত হয় নাই।

(২) পার্থপরাজয় নাটক—

অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদা-পুত্র বভ্রুবাহণের যুদ্ধে অর্জ্জুনের পরাজয়ের

*বিস্তৃত বিবরণ 'ইণ্ডিয়ান ষ্টেজে' দ্রষ্টব্য

কাহিনীমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক ১৮৮১ সালে রচিত। ইহা গীতবাহুল্য নাটক, কারণ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ বাহু প্রভৃতি গ্রামে গীতাভিনয়রূপে অভিনীত হইয়াছিল। একটি গান এই—

"রণসাজে পদ্মিনীদল চলরে।
ভ্রুকুটি নয়না—ধর্ ধর্ মার মার করে কি ভীষণা—
পদভরে কম্পিতা ধরা টলে রে।"

কেবল পার্থপরাজয় নাটক নহে, মনোমোহনবাবুর নাটক মাত্রই গীতবহুল। ইহার কারণ "সতী নাটকের" ভূমিকায়ই তিনি লিখিয়াছেন, "ইউরোপে নাটক কাব্যে গান অল্পই থাকে, আমাদের তথাবিধ গ্রন্থে গীতাধিক্য প্রয়োজন। এটি জাতীয় রুচিভেদে স্বাভাবিক। যে দেশের বেদ অবধি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ধারাপাত পাঠ পর্য্যন্ত স্বর সংশোধন ভিন্ন সাধিত হয় না, যে দেশের অপর সাধারণ জনগণ লোকের হীনাবস্থায়ও যাত্রা, কবি, পাঁচালি, ফুল ও হাফ্ আখ্ড়াই কীর্ত্তন, তর্জ্জা, ভজন প্রভৃতি নিত্য নতুন সঙ্গীতামোদে আবহমান ঘোর আমোদী—সেদেশের দৃশ্যকাব্য যে সঙ্গীতাত্মক হইবে, ইহা বিচিত্র কি?"

যে সময়ে যাত্রাগানের বিশেষ প্রচলন, সে সময়ে নাটক গীতাধিক্য করিয়া মনোমোহন নাটকের দিকে লোকদিগকে প্রথমে আকৃষ্ট করেন। নাটকের গীতবাহুল্যেই মধুসূদন দীনবন্ধুর সহিত মনোমোহনের পার্থক্য।

'পার্থপরাজয়'কে 'গীতাভিনয়'ও বলা চলে।

গীত প্রবর্ত্তনে এ যুগে গিরিশচন্দ্রই প্রথম প্রবর্ত্তক। মনোমোহন বোধহয় তাহাকেই অনুসরণ করিয়াছেন। কারণ সতী নাটক সধবার একাদশী অভিনয়ের তিন বৎসর পরে রচিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সধবার একাদশীতে গিরিশ কয়েকটি গীত সংযোজনা করেন।

(৬) রাসলীলা নাটক রচিত হয় ১৮৮৩, ইহাও পঞ্চাঙ্ক নাটক ইহাতে আয়ান ঘোষ, জটিলা, কুটিলা কৃষ্ণ, রাধিকা এবং ললিতা সখী প্রভৃতির কথা আছে রচিত হয়।

একটি গান বড় সুন্দর—

মোহন মুরলি। বাজতো।
আমার রাধা নামে সাধা বাঁশি! একবার বাজতো।

(৭) আনন্দময় নাটক ১৮৯০ সালে মুদ্রিত (১২৯৭ আষাঢ়)

আনন্দময় হাঁসখালির জমিদার—তাহার পুত্র ভূষণ সর্ব্বাধ্যক্ষ (ম্যানেজার) কান্ত মিত্রের ষড়যন্ত্রে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত, ভূষণের পুত্র পুলিন এবং ললিতও নানারূপে লাঞ্ছিত। রাধু সরকার ছিল কান্তের পাপকর্ম্মে প্রধান সহায়। আনন্দময় স্ত্রী পুত্র নাতির শোকে জরাগ্রস্ত কিন্তু তথাপি দুষ্ট কান্ত মিত্রের উপরে তার ঘোরতর বিশ্বাস। ঘটনা এই যে চণ্ডীমালিনী নামে একটা দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক অন্তঃপুরের মহিলাদের নানাভাবে ভুলাইয়া আনিয়া দুষ্টলোকের সহায়তায় ধর্ম্মনষ্ট করিত। চরিত্রবান তেজস্বী ভূষণ তাহাকে তলোয়ারের সহায়তায় শাস্তি দিতে যায়। চণ্ডীর প্রাণ বাঁচিলেও কান্ত রাষ্ট্র করে যে ভূষণের আঘাতেই তাহার প্রাণবধ হইয়াছে। ভূষণ কানপুরে পলাতক ভাবে থাকে। চণ্ডী পূর্ব্বে পুলিনকে চুরি করিয়া রাখিয়াছিল, পরে তাকে সঙ্গে করিয়া পলাইয়া যায় এবং সযত্নে পালন করে। যে কারণেই হোক, চণ্ডীর চরিত্র ভাল হয়, এবং সে এই নাটকের প্রধান চরিত্র ভৈরবী,—'নাম' করিয়া বেড়ায় এবং পরের উপকার করে। ভূষণ যখন তাহার বিবাহিতা স্ত্রী কিরণশশীকে ও পুত্রদ্বয়কে লইয়া নৌকাযোগে বাড়ী আসিতেছিল, কান্তের ও রাধুর ষড়যন্ত্রে তাহারাও বিপদগ্রস্ত হয়। ভূষণ হয় ব্রহ্মচারী, আর কিরণ আশ্রয় পায় কান্তের স্ত্রীর যত্নে তাহারই গৃহে ভবনাম ছদ্মবেশে। ললিত

বহুকষ্টে অন্যত্র আশ্রয় পায়। ভবর দুগ্ধপোষ্য পুত্র নির্ম্মলই রাধুর পুত্র বলিয়া পরিচিত হয়। রাম্ নায়েব এবং ভৈরবীর চেষ্টায়ই আনন্দময় সকলকে ফিরাইয়া পায়।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রসিদ্ধ নাটক প্রফুল্ল ও হারানিধির পরে এই সামাজিক নাটকখানি রচিত। ইতিপূর্ব্বে রাধামাধব করের সরোজা (এমারেল্ডে অভিনীত) এবং বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত শৈলজাও 'আনন্দময়' নাটকের পূর্ব্বগামী। নাটকখানির কাহিনীটি মন্দ না হইলেও, সকলের একসঙ্গে মিলনে যেন উপন্যাসের কাহিনীর মত মনে হয়। ভূষণ চরিত্রে হারানিধির হরিশের ছায়া দেদীপ্যমান, কাম্ন মিত্র, রাধু সরকার, "প্রফুল্লের" রমেশ ঘোষ ও কাঙ্গালী চরণেরই দ্বিতীয় সংস্করণ। কাম্ন মিত্রে আবার মোহিনী মিত্রের (হারানিধির) ভাবও কতকটা আসিয়া পড়িয়াছে। কিরণশশীতেও নূতনত্ব নাই। ইন্স্পেকটার জমাদারও 'প্রফুল্লের' মতই আছে, তবে আনন্দময়ের মহত্বে কাম্ন মিত্রের পরিণাম বিষাদাচ্ছন্ন হইতে পারে নাই।

নীলুঠাকুরের জীবিতা কন্যা বিধুর মৃত্যু ঘোষণা করিয়া ললিতকে সেই ঘটনার সঙ্গে সংযোজিত করায়ও নাটকখানি উপন্যাসাকার ধারণ করিয়াছে। আনন্দময়ের চরিত্রে যথেষ্ট অস্বাভাবিকতা আছে। পুত্র পুত্রবধূ সব হারাইয়াও চক্রান্তকারী কাম্নের উপরে তাহার অগাধ বিশ্বাস নাটকীয় অবস্থার উপযোগী নয়। কাম্ন মিত্রের স্ত্রী কল্যাণীর চরিত্রে সজীবতা এবং সরস ভাব বেশ বিদ্যমান। তবে নীচ জাতীয়া কুসঙ্গপ্রিয়া দুশ্চরিত্রা ভৈরবী যে হঠাৎ শোধরাইয়া নাটকের প্রধানা চরিত্ররূপে সকলের উপকার করিয়া বেড়াইতেছে ও নাটকের কাহিনীটি সমাধানের দিকে লইয়া যাইতেছে, ইহা মোটেই নাটকের বিষয়-বস্তুর প্রস্ফুরণের ফলে হয় নাই, ইহাতে যথেষ্ট অস্বাভাবিকতা আছে। হারানিধির কাদম্বিনী ও নসীরামের সোণা চরিত্রের বিকাশ হইয়াছে অবস্থার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু ভৈরবীর পরিবর্ত্তন নিতান্তই

আকস্মিক ও অস্বাভাবিক। তার মুখে বিধবা বিবাহের বক্তৃতাও অশোভন। জেলখানায় রাধু সরকারের পাগ্‌লামির ভাণে বিশেষত্ব নাই। শেষদৃশ্যে সস্ত্রীক কান্ত মিত্রের প্রতি কাশীবাসের ব্যবস্থা, কান্তের কন্যা নির্ম্মলার সঙ্গে ভূষণের পুত্র পুলীনের বিবাহে—আনন্দময়ের গৃহ আনন্দ-নিকেতনে পরিণত হয়।

মনোমোহনের সামাজিক নাটক অপেক্ষা পৌরাণিক নাটকেই অধিকতর কৃতিত্ব প্রকটিত হয়।

মনোমোহনের "কেঁড়েল চন্দ্র ঢাকেন্দ্র প্রণীত "নাগেশ্বরের অভিনয়" একখানি ব্যঙ্গমূলক প্রহসন। ১২৮১ সনের শ্রাবণের "মধ্যস্থ" পত্রিকায় ইহার বিস্তারিত সমালোচনা আছে। ব্যঙ্গের বিষয়ের নববিধান সমাজের কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার 'ভারতাশ্রম'। পুরুষের স্বাধীনতা ও স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতা লইয়া ঠাট্টা করা হইয়াছে। ব্যঙ্গমূলক প্রস্তাবনাটি সুন্দর—

"হায়; বঙ্গবাসী ভীরু
তেজোহীন—পোষা পশুপ্রায় চিরকাল
রহিবি কি বাপ মার বশে?"

কেশববাবুকে করা হইয়াছে নাগাধিপতি বাসুকি, নাগলোক হইতে নরাকারে অবতীর্ণ হইয়া ভাগ্যহান বঙ্গদেশকেই লীলাভূমি ও ক্রীড়াস্থানে পরিণত করা হইয়াছে। আদিব্রাহ্ম সমাজের লোক দিগকে করা হইয়াছে খগেন্দ্রবংশ। হিন্দু পেট্রিয়ট্‌কে করা হইয়াছে চাঁদসদাগর, কারণ উহা মনসার (অর্থাৎ কেশববাবুর) পূজা ও অর্চ্চনা করিতে নারাজ। কেশববাবু সম্বন্ধে ব্যঙ্গ করা হয়—

"যখন আমার মুখ থেকে বেরিয়েছে, পুস্তকে না থাকলেও আছে।"

আরেক স্থানে আছে—

"খগেন্দ্র-বংশ পাকা খুঁটি কেঁচে বসেছে, সেই মূর্খেরা হিন্দুর দলে মিশে যাচ্ছে।"

শ্রীযুক্ত ডক্টর সুকুমার সেন যে বলেন এই নাটক পূর্ব্ববঙ্গবাসী কোন আশ্রমকে উপলক্ষ করিয়া লিখিত, তাহা ঠিক নহে। এখানে মূলটি লক্ষ্যচ্যুত হইয়াছে। এইরূপ কাল্পনিক অনুমান করিয়া তিনি বড়ই ভুল করিয়াছেন। বিস্তারিত আলোচনা উপরোক্ত মধ্যস্থে (শ্রাবণ ১২৮১) প্রাপ্তব্য।

মনোমোহন বসুর পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরই সেই সময়কার প্রসিদ্ধ নাট্যকার। তিনি ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বন করিয়াই নাটক লিখিতেন। উপেন্দ্র নাথ দাসের শরৎসরোজিনী, সুরেন্দ্রবিনোদিনীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি কোন ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক বিষয় লইয়া নাটক লেখেন নাই। তাহার নাটকের মধ্যে কিছু সৌন্দর্য্যও আছে। শিশির কুমার ঘোষের নয়শো রূপেয়া, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর নন্দবংশোচ্ছেদ, কুলীন কন্যা (অথবা কমলিনী) হরলাল রায়ের হেমলতা, শত্রুসংহার, বঙ্গের সুখাবসান, রুদ্রপাল, কনকপদ্ম প্রভৃতি নাটকেরও সেই সময়ে কিছু আদর ছিল। এতদ্ব্যতীত মীর মসারফ হোসেন প্রণীত "জমিদার দর্পণ" নাটকখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই সময়ে নাটকের একরকম ধূমই পড়িয়াছিল, যেমন রাধানাথ বর্ম্মণ রচিত সরোজিনী নাটক—অনেকটা দীনবন্ধুর অনুকরণে রচিত। নাটকের রুচি সম্বন্ধেও বঙ্গদর্শন (১২৮০ ভাদ্র) বিশেষ ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্বিতীয় গ্রেট বারবারস্ ড্রামা—'নাপিতেশ্বর' নাটক হাবড়ার পুলিষের মোকদ্দমার বৃত্তান্ত লইয়া প্রণীত। যাহাহউক এই সময়ে মীর মসারফ হোসেনের সুলিখিত "জমিদার দর্পণ" নাটকখানি বিশেষ সমাদরণীয়। নাটক দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই, তাই সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের মতামত এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

"জনৈক কৃতবিদ্য মুসলমান কর্ত্তৃক এই নাটকখানি বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষায় প্রণীত হইয়াছে। মুসলমানী বাঙ্গালার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই। বরং অনেক হিন্দুর প্রণীত বাঙ্গালা অপেক্ষা, এই মুসলমান লেখকের বাঙ্গলা পরিশুদ্ধ।

"জমিদারদিগের অত্যাচারের কাহিনী উদাহরণের দ্বারা বর্ণিত করা উহার উদ্দেশ্য। নীলকরদিগের সম্বন্ধে বিখ্যাত নীলদর্পণের যে উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ জমিদার সম্বন্ধে ইহারও সেই উদ্দেশ্য।

"এই দর্পণে জমিদারের যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, তাহা বিকৃত কি প্রকৃত সে বিষয়ের আমরা কিছুমাত্র আলোচনা করিতে চাহিনা, এ তাহার সময় নহে। বঙ্গদর্শনের জন্মাবধি এই পত্র প্রজার হিতৈষী। এবং প্রজার হিত কামনা আমরা কখনও ত্যাগ করিব না। কিন্তু আমরা পাবনা জিলায় প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত এবং বিষাদযুক্ত হইয়াছি। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজনীয়। আমরা পরামর্শ দিই যে গ্রন্থকারের এ সময়ে এ গ্রন্থ বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা কর্ত্তব্য।"

"কিন্তু সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ইহা আমাদিগের বলা কর্ত্তব্য যে নাটকখানি অনেকাংশে ভাল হইয়াছে। আমরা প্রজা। জমিদারের কথা বলিতে চাহি না, কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে সেসনআদালতের চিত্রটি অতি পরিপাটি হইয়াছে। তদংশ উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল, স্থানাভাব প্রযুক্ত পারিলাম না। ইহাতেও অনেক পরিহাস্য কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে।" *

হরলালবাবুর রুদ্রপাল (ম্যাকবেথের অনুবাদ) অভিনীত হয় গ্রেট ন্যাসনালে ৩১, অক্টোবর ১৮৭৭, শত্রুসংহার ২রা ডিসেম্বর, সজ্জের সুখাবসান হয় ২৬ ডিসেম্বর ১৮৭৪।

* বঙ্গদর্শন, ভাদ্র,১২৮০

• "শত্রুসংহার" সম্বন্ধে 'অবোধ বান্ধব' পত্রিকা বলে—"অশ্বত্থামার ক্রোধ ও ভীমের প্রতিজ্ঞায় রক্ত উত্তেজিত হয়।"

"বঙ্গের সুখাবসান" সম্বন্ধে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন—

"১৮৭৫ সালের ৩০ জুলাই তারিখে আমি তদানীন্তন লেফ্‌টেনেন্ট গভর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল দ্বারা বেলভিডিয়ার ভবনে সান্ধ্য সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হই। ইহাতে সকল প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা গ্রন্থকারদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল।....সকল গ্রন্থকর্ত্তা অপেক্ষা মনোমোহন বসু ছোটলাট সাহেবের নিকট অধিক আদর প্রাপ্ত হইলেন।... হেয়ার স্কুলের শিক্ষক হরলাল রায়ের প্রণীত "বঙ্গের সুখাবসান" নাটকের কথা পাড়িয়া ছোটলাট তাহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। সেই নাটকে হরলালবাবু কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্বাধীনতা প্রকাশ করাতে ছোটলাট সাহেবের নিকট উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন।"

হরলাল রায়ের 'হেমলতা নাটক' সম্বন্ধে বঙ্গদর্শন বলিয়াছে—

"...তথাপি হেমলতা নাটক, প্রকৃত নাটক না হউক পাঠ্য পুস্তক বটে; পাঠ্য কাব্যও বটে। রসপূর্ণ উপন্যাস রচনা নিতান্ত সামান্য ক্ষমতার কর্ম নহে। হেমলতা নাটক রসপূর্ণ উপন্যাস বটে, ইহাতে বীররস করুণ রস উভয় মিশ্রিত হইয়া আছে।

"উপন্যাস রসপূর্ণ বটে, কিন্তু লেখায় তেমন রস নাই। এটি এই গ্রন্থের প্রধান দোষ। গ্রন্থের কতকগুলি গুণ আছে। ইহার ভাষা সুন্দর, সরল। উপন্যাসটি সুন্দর গ্রথিত! অশ্লীলাদি কোন দোষ ইহাতে নাই।

"...যাহাহউক সকল দিক্ বিবেচনা করিতে গেলে বলিতে পারা যায় যে হেমলতা নাটক এখানকার প্রচলিত অনেক নাটক অপেক্ষা অনেকাংশে উত্তম। ...ইহা নাটক না হইয়াও অভিনয় যোগ্য।

• রাজনারায়ণবাবুর আত্মচরিত ২১৬—২১৭

ভরসাকরি ন্যাসনাল থিয়েটার মোহান্ত নাটক, নবীন নাটক, নাপিতেশ্বর নাটক পরিত্যাগ করিয়া হেমলতা নাটকের ন্যায় বিশুদ্ধ সরল রসপূর্ণ উপন্যাসের অভিনয় করিয়া কৃতবিদ্যের মনোরঞ্জন ও সাধারণের উপকার সাধনের চেষ্টা করিবেন। *"

হেমলতা নাটক 'কমলে কামিনী'র ছায়া বলিয়া অনুমিত হয়।

হরলাল রায়ের "কনক পদ্ম" শকুন্তলা হইতে অনূদিত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক তৎকালে বিশেষ সমাদৃত হয়। তিনি একজন পণ্ডিত, কবি, গবেষক এবং প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন। তিনি অনেক নাটক রচনা করেন, তন্মধ্যে পুরু-বিক্রম ও সরোজিনী নাটকই প্রধান। 'অশ্রুমতী' নাটকও বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। তিনখানি নাটকই ঐতিহাসিক এবং উহাতে অনেক জাতীয়তামূলক কথার অবতারণা আছে। পুরুবিক্রম জ্যোতিরিন্দ্র নাথের প্রথম নাটক, ইহার বিষয়বস্তুও ভাল। চরিত্র সৃষ্টিও নিন্দনীয় নয়, তবে নাটকের জাতীয়তা মূলক কথা ও ভাবে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়না। নাটকখানি ১৮৭৪ সালে গ্রেট ন্যাসনাল এবং বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়। পুরুবিক্রমই বাঙ্গলার প্রথম জাতীয়তা মূলক নাটক। মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী প্রথম ঐতিহাসিক নাটক হইলেও পুরুবিক্রমে উহার ক্রমোন্নতি। কলিকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর চেষ্টায় অনুষ্ঠিত এবং রাজনারায়ণ বসু, মনোমোহন বসু এবং নব গোপাল মিত্রের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত "হিন্দু মেলায়" স্বদেশী ও জাতীয়তা মূলক ভাবের প্রথম সূচনা। জাতীয়তা মূলক 'বঙ্গদর্শন'ও এই নাটক রচনার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হয়। এই পটভূমিকায়ই নাটকখানির আলোচনা করিলে ইহার মর্ম্ম স্পষ্ট বুঝা যাইবে। পুরুবিক্রম সম্বন্ধে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যে

ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৮৭৩, ১৩ ডিসেম্বরে অভিনীত হয়

সমালোচনা করেন, তাহাই পাঠকের বিদিতার্থ এইখানে উপস্থিত করিতেছি :

"পুরুবিক্রম নাটক। কলিকাতা বাল্মিকী যন্ত্রে শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত শকাব্দ ১৭৯৬। মূল্য ১৲ টাকা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ মধ্যে সেকেন্দার সা (Alexander) পুরু (Porus) তক্ষশীল (Taxilus) এফেষ্টিয়ান ইহারাই প্রধান, মহিলাগণের মধ্যে ঐলবিলা—কল্লুপর্ব্বতের রাণী, এবং অম্বালিকা—তক্ষশীলের ভগিনী প্রধানা।

"মহাবীর সেকেন্দর সা সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারত বিজয়ে অগ্রসর হইতেছেন, বিতস্তা নদীতীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন। রাণী ঐলবিলা স্বদেশের উদ্ধারার্থ কৃত-সঙ্কল্পা। তিনি অবিবাহিতা, রূপ ও গুণবতী। প্রচার করিয়াছেন যে "যে কোন ক্ষত্রিয় রাজা স্বদেশের জন্য যবনদিগের সহিত যুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বীরত্ব প্রকাশ করিবেন, তিনি তাহারই পাণিগ্রহণ করিবেন। মনে মনে পুরুরাজের শৌর্য্য বীর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, এবং তাহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে পুরুরাজ বীরত্বে তদীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন। এদিকে পুরুরাজও যথার্থই বীরপুরুষ ও ঐলবিলার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। তক্ষশীলও ঐলবিলার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, কিন্তু তক্ষশীল কাপুরুষ এবং স্বীয় ভগিনী অম্বালিকাকে সেকেন্দার সার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে ইচ্ছুক।

"...অম্বালিকাও সেকেন্দরের অনুরক্তা। ভ্রাতা ভগিনী বন্দোবস্ত করিল উভয়ে উভয়ের সাহায্য করিবে। তাহারা ঐলবিলা ও পুরুরাজের মধ্যে মনোভঙ্গ সাধনার্থ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। এদিকে সেকেন্দর রাত্রির অন্ধকারে বিতস্তা পার হইয়া আসিলেন। পুরুরাজ ও সেকেন্দরে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইল। পুরুরাজ আহত ও বন্দী হইলেন। ষড়যন্ত্রের ফলে পুরু ঐলবিলার প্রণয়ে সন্দেহ করিতে

লাগিলেন ও হঠাৎ তক্ষশীলকে বধ করিলেন। পরে সেকেন্দর পুরুর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাহার শৃঙ্খল মোচন করিলেন এবং অম্বালিকাকে গ্রহণ করিলেন না। অম্বালিকা স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পুরু ও ঐলবিলার সন্দেহ ভঞ্জনপূর্ব্বক তাহাদের মিলন করিয়া দিলেন।

"এই উপন্যাসে বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু নাটকে তাদৃশ বৈচিত্র্য নাই। সকলেই কাটা কাটা কথা কহে। লেখক যে কৃতবিদ্য ও নাটকের রীতিনীতি বিলক্ষণ জানেন তাহা গ্রন্থ পড়িলেই বোধ হয়। গ্রন্থখানি বীররস প্রধান এবং গ্রন্থে বীরোচিত বাক্য বিন্যাস বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যেন বীররসের খতিয়ান বলিয়া বোধ হয়। যেন সকল কথাতেই গুজরত ও মারফত লেখা আছে বলিয়া বোধহয়। আন্তরিক ভাব বলিয়া বোধ হয় না। কে যেন বলিল, কে যেন শুনিল, কে যেন সেই কথাগুলি ছাপিয়াছে, আমরা পড়িলাম। নহিলে অঙ্গ কণ্টকিত হইল না কেন? গ্রন্থের এই মর্ম্মভেদকতার অভাবে আমাদের দুঃখ হইয়াছে। পুরুবিক্রম সন্দর্শনে যে অন্তরাত্মা জাগিলনা তাহাতেই আমাদের দুঃখ হইয়াছে। যাহাহউক এইরূপ কৃতবিদ্য এবং মার্জ্জিত রুচি মহাশয়গণ নাটক প্রণয়নের ভার গ্রহণ করেন, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে নিতান্তপক্ষে বাঙ্গলা নাটকের বর্ত্তমান অশ্লীলতা এবং কদর্য্যতা থাকিবেনা।"

অভিনয়ে পুরু হইতেন বেঙ্গল থিয়েটারে শরৎবাবু। তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতেন। ন্যাশনেলে হইতেন মহেন্দ্র বসু। আলেকজাণ্ডার (সেকেন্দর সা) হইতেন যথাক্রমে হরিদাস দাস ও নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রাণী ঐলবিলা হইতেন বেঙ্গলে সুকুমারী দত্ত ও গ্রেট ন্যাসনেল শ্রী ক্ষেত্রমণি দেবী।

ন্যাসনালে "পাঞ্জাব প্রদেশস্থ সামন্তগণ" কথা অভিনেত্রীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই (ক্ষেত্রমণি দেবী) একসঙ্গে বলিতে পারিতেন।

নাটক সম্বন্ধে কলিকাতা রিভিউ (Calcutta Review 1874 Vol. 59) বলে—

"Plot is certainly very interesting and well-drawn. The different phases of the Rajput character are admirably exhibited. Porus and Ailabila—hero and heroine are very types of Rajput warrior and his queen. Taxilas and Ambalika present very striking contrast to Porus and Ailabila. Their weakness, their vacillation, their treachery set off very conspicuously the virtues of constancy and patriotism in characters of hero and heroine. Look at the language and the spirit of the stirring words which Porus uses to infuse animation into the hearts of his soldiers arrayed in the field—

"উঠ, জাগ, বীরগণ,
দুর্দ্দান্ত যবনগণ গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ
হও সবে একপ্রাণ মাতৃভূমি কর ত্রাণ
শত্রুদলে করহ নিঃশেষ
বিলম্ব না সহে আর, উলঙ্গয়ে তলবার
জ্বলন্ত অনল সম চল সবে রণে
বিজয় নিশান দেখ উড়িছে গগনে।
যবনের রক্তে ধরা হক প্লবমান
যবনের রক্তে নদী হোক বহমান
যবন শোণিত বৃষ্টি করুক বিমান
ভারতের ক্ষেত্র তাহে হোক ফলবান্
এইবার বীরগণ কর সবে দৃঢ় পণ
মরণ শরণ কিম্বা যবন নিধন

যবন নিধন কিম্বা মরণ শরণ
শরীর পতন কিম্বা বিজয় সাধন

Porus when the latter asked for a kiss before the battle—

"যান রাজকুমার, অগ্রে যুদ্ধে জয়লাভ করুন, এখন প্রেমাভিনয়ের সময় নয়।"

reminding us of Mercia's reply to Juba on a similar occasion :—

"I should be grieved, young prince, to think my presence
Unbent your thoughts and slackened them to army
While, warm with slaughter, our victorious foe
Threatens aloud and calls you to the field.

ঐলবিলা's conduct in her captivity does great credit to her.

"The glory of Alexander's character is greatly obscured, if not totally elipsed by his connection with অম্বালিকা and consenting to and even participating in her wicked intrigues."

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তাহার সম্পাদিত "বেঙ্গল ম্যাগেজিনে" দীর্ঘসমালোচনায় শেষ করিয়া উপসংহারে লিখিয়াছেন—

"ইহার ভাষা সহজ, কোন কোন চরিত্র নিপুণ ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।" *

---

* জ্যোতিরিন্দ্র নামের নাটক সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা প্রামাণ্য। জীবনস্মৃতি সম্বন্ধে কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতি বেশ উপভোগ্য ও উল্লেখযোগ্য।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বিতীয় নাটক 'সরোজিনীর' গল্পভাগ এইরূপ :

দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজী চিতোর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে মহম্মদ আলি নামক একজন মুসলমান চিতোরকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ভৈরবাচার্য্য নামে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী চতুর্ভুজা দেবীর মন্দিরের পুরোহিত হন। একদিন সে রাণা লক্ষ্মণসিংকে দেবীর প্রত্যাদেশ শুনান "বৃথা যবন যুদ্ধে দরকার নাই, তবে সরোজিনীকে যদি দেবীর কাছে বলি না দেওয়া যায়, তবে চিতোরের পতন অনিবার্য্য, আর রাণার দ্বাদশপুত্র যদি যবন সমরে না মরে, তবে রাজলক্ষ্মী অন্তর্ধান করিবেন।" একদিকে কন্যাটিকে মারিয়া ফেলা, অন্যদিকে দেবীর আদেশ—অনেক ঘাত প্রতিঘাতের পরে সেনাপতি রণধীর সিংহের পরামর্শক্রমে কন্যাকে বলি দেওয়াই স্থির হইল। সমস্ত রক্ষা পায় বাংলাধিপতি বিজয় সিংহের কৌশলে। সমস্ত ষড়যন্ত্রটি উদ্ঘাটিত হয়, কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই আলাউদ্দিন চিতোরে প্রবেশ করিয়াছিলেন রাজপুত বীরগণ প্রাণতুচ্ছ করিয়া যুদ্ধ করেন এবং রাজপুত রমণীগণ নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি গাহিতে গাহিতে আক্রমণকারী মুসলমানের হাত হইতে সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করেন—

"জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরাণ সপিঁবে বিধবাবালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥
দেখরে যবন দেখ্‌রে তোরা
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে!
সাক্ষী রহিলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে।"

পুরুবিক্রমের চরিত্রসৃষ্টি অপেক্ষা সরোজিনীর চরিত্রসৃষ্টি উজ্জ্বলতর। কিন্তু ভৈরবাচার্য্যের জনৈক চেলা যে বঙ্গদেশীয় মুসলমানী ভাষায় 'চাচা, মুই' প্রভৃতি কথায় এত উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করিত, ইহা রাজপুরীতে সম্ভব নয় বলিয়া মনে হয়। যাহাহউক নাটকে অভিনয় খুব জমিত। এবিষয়ে সরোজিনীর ভূমিকায় তৎকালীন রঙ্গালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা রূপদক্ষা স্বর্গীয়া বিনোদিনী দাসী তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন—

"সরোজিনী নাটকখানির অভিনয় ভারি জম্‌ত। অভিনয় কর্‌তে কর্‌তে আমরা একেবারে আত্মহারা হ'য়ে যেতাম—দর্শক বৃন্দও আত্মহারা হ'তেন। একদিনের ঘটনা বলি—সরোজিনীকে বলি দেবার জন্য যূপকাষ্ঠের কাছে আনা হ'ল,...রণধীর সিংহ শীঘ্র কাজ শেষ হবার জন্য তাগিদ দিচ্ছেন। কপট ব্রাহ্মণ বেশধারী ভৈরবাচার্য্য তরবারী হস্তে সরোজিনীকে যেমন কাট্‌তে এসেছে এমন সময় বিজয়সিংহ যেমন সেখানে ছুটে এসে বল্‌লেন, 'সব মিথ্যে, সব মিথ্যে, ভৈরবাচার্য্য ব্রাহ্মণ নয়, মুসলমান, সে মুসলমানের চর'—অম্‌নি সমস্ত দর্শক একেবারে ক্ষেপে উঠে মার মার কাট কাট ক'রে যে যার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দুইজন দর্শক এত উত্তেজিত হয়েছিলেন যে, তারা একেবারে উত্তেজিত হয়ে ষ্টেজের উপরে উঠে পড়্‌লেন...সব যখন ঠাণ্ডা হ'ল আবার অভিনয় আরম্ভ হ'ল।"

বিজয়সিংহ বেশে অমৃতবসু মহাশয় নিম্ন কথাগুলি বেশ ভাবের সঙ্গে বলিতেন—

"আমাদের কার্য্যত আমরা করি, যা হ'বার তা হবে। ভবিষ্যদ্বাণী দৈববাণীর কথাশুনে যেন আমরা কতকগুলি অলীক বিঘ্নের আশঙ্কা না করি। যখন মাতৃভূমি আমাদিগকে কার্য্য কর্ত্তে বলবেন, তখন তাই যথেষ্ট, আর কোনদিকে দৃষ্টিপাত করবার প্রয়োজন নাই।

মাতৃভূমির বাক্যই আমাদের একমাত্র দৈববাণী। দেবতারা আমাদের জীবনের একমাত্র হর্তা কর্তা সত্য; কিন্তু মহারাজ! কীর্ত্তিলাভ আমাদের নিজের চেষ্টার উপরেই নির্ভর করে। অতএব অদৃষ্টের প্রতি দৃক্‌পাত না ক'রে পৌরুষ আমাদিগকে যেখানে যেতে বল্‌বে—চলুন আমরা সেইখানে যাই।"

লক্ষণ সিং হইতেন মতিলাল সুর, আর রণধীর সিং মহেন্দ্রনাথ বসু। সরোজিনী অভিনীত হয় ১৮৭৫, ২৬শে ডিসেম্বর।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তৃতীয় নাটক 'অশ্রুমতী' প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ সালে জুলাই মাসে আর বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয় ১৮৮০ সেপ্টেম্বরে।

সকলেই জানেন রাজপুতগণের মধ্যে একা বীরবর প্রতাপ সিংহ তুর্কীর হস্তে কোন কন্যাদান করিয়া বংশগৌরব কলঙ্কিত করেন নাই সেনাপতি মানসিংহ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতাপ তাহার সহিত একত্র ভোজনে অসম্মত হন। মানসিংহ প্রতিজ্ঞা করেন "আমি যদি তার দর্পচূর্ণ কর্ত্তে না পারি, আমার নাম মানসিংহ নয়।" যুদ্ধ করিতে করিতে প্রতাপসিংহ যখন ভীলসর্দ্দারের আশ্রয়ে থাকেন, ফরিদ খাঁ নামক একব্যক্তি মানসিংহের উপদেশ ক্রমে অশ্রুমতীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। সেলিম তাহাকে বিশেষ সম্মানের সহিত রাখেন। পরস্পর পরস্পরে অনুরক্ত হয় এবং প্রতাপের সহোদর শক্ত সিংহ মোগল শিবির হইতে অশ্রুমতীকে প্রতাপের নিকট লইয়া যায়। প্রতাপ কন্যার বিষপানে হত্যার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু যখনই জানিতে পারিলেন কন্যার শুচিতা নষ্ট হয় নাই, তাহাকে যোগিনীব্রতে দীক্ষিতা হইতে আদেশ করিয়া মহাপ্রস্থান করেন। প্রতাপ সিংহের বীরত্ব, সাহস এবং স্বাধীনতা-স্পৃহা নাটকে যথাযথভাবে প্রকটিত হইয়াছে। ভীল সর্দ্দারের সারল্য এবং রাজভক্তি সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। মলিনার স্বামীভক্তি খুব সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার গান

"এখনো এখনো প্রাণ সে নাম শিহরে কেন" হৃদয়স্পর্শী কিন্তু কবি পৃথ্বিরাজের কাঠিন্য চরিত্রোপযোগী নয়। অশ্রুমতীর চরিত্র, প্রগতি সম্পন্ন নারীর মত করা হইয়াছে। বিধর্ম্মী আশ্রয়দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও অনুরাগ, যোগিনী হইয়াও প্রেমিকের স্মৃতি—সবই সাধারণে সম্ভব, বীরবর প্রতাপ সিংহের কন্যার পক্ষে নহে—সে চিন্তায়ও আদর্শ বীর প্রতাপের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা বাধা পায়। বিশেষতঃ এই চিত্র কাল্পনিক ও ইতিহাসবিরোধী।

শরৎ ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুর পরে বেঙ্গল থিয়েটারে তাহার সম্মান রজনী উপলক্ষে অশ্রুমতী নাটক অভিনীত হয় এবং অনুরুদ্ধ হইয়া গিরিশচন্দ্র প্রতাপ সিংহের ভূমিকায় নামেন। দুই এক অঙ্কের পরে তিনি চলিয়া যান কিন্তু এরূপ হঠাৎ চলিয়া যাইবার কারণ কেহ নির্দ্ধারণ করিতে পারেনা। কয়েকজন খুঁজিয়া তাহার কাছে উপস্থিত হইলে বলেন, "আগে যদি ঘুণাক্ষরে জানতাম যে প্রতাপসিংহের কন্যা আকবর-পুত্র সেলিমের অনুরাগিনী, তবে কি এরূপ অভিনয়ে সম্মতি দিই?"

যাহাহউক অশ্রুমতীর গান 'ছেড়েছি সব বাসনা, প্রেমের কথা আর বলোনা মার তুলনা, ভাল থাক, সুখে থাকহে বন্ধু' ও সেলিমের বিষণ্ণতা শেষদৃশ্যে বেশ মর্ম্মস্পর্শী।

অশ্রুমতী হইত বনবিহারিণী আর মলিনা হইত সুকুমারী দত্ত।

অশ্রুমতী নাটকের পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর উল্লেখযোগ্য নাটক লেখেন নাই। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতেন "প্রকৃত নাট্যকার এসেছে, আর আমার দরকার নাই।" নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয় কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি উত্তর করেন "নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্র প্রবেশ করিয়াছেন, আমার নাটক রচনার আর প্রয়োজন নাই।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলিতেন—

"ইহার কিছুদিন পরেই গিরিশবাবু যখন নাটক লিখিতে লাগিলেন, তখন আমরা ক্রমশঃ হটিয়া পড়িতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে গিরিশবাবুর অসামান্য প্রতিভা নাট্যসাহিত্যে একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিল। আমিও নাটক-রচনা যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে ছাড়িয়া দিয়া, সাহিত্য সেবার অন্য পন্থা অবলম্বন করিলাম"।* ইহার পরে তিনি "স্বপ্নময়ী" নামক আর একখানি জাতীয়তা-উদ্দীপক নাটক লেখেন। ইহা বর্দ্ধমানের শোভাসিংহের বিদ্রোহাবলম্বনে রচিত। শোভাসিংহ বর্দ্ধমান রাজ-দুহিতার অবমাননা করিতে উদ্যত হইলে তিনি তাহাকে হত্যা করেন। কিন্তু নাটকে শোভা সিংহকে যথার্থ দেশভক্তরূপে এবং রাজকুমারীকে তাহার দীক্ষিতা শিষ্যারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। শোভাসিংহ ও রাজকুমারীর মুখে অনেক উদ্দীপনাময়ী বাক্য সংযোজিত হইয়াছে।

উপরোক্ত নাটক ব্যতীত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কয়েকখানি প্রহসনও প্রণয়ন করিয়াছেন তন্মধ্যে "কিঞ্চিৎ জলযোগ" এবং "অলীকবাবুই" প্রধান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপন্যাস এমন কর্ম্ম আর করবোনা, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। পরে ইহাই আবার 'অলীকবাবু' নামে পুনর্মুদ্রিত হয়।

অলীকপ্রকাশ বঙ্কিম বাবুর নভেলে দীক্ষিতা সত্যসিন্ধু বসুর কন্যা হেমাঙ্গিনীর পাণিপ্রার্থী। সত্যসিন্ধু বসু কলিকাতার এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে পরীক্ষা দিতেছেন—প্রতি কথায়ই উত্তর দিতেছেন এবং প্রতারণা-পূর্ণ উক্তিতে সত্যসিন্ধু যখন কন্যা সমর্পণ করিবেন স্থির করিয়াছেন, তাহার সমস্ত কথার অলীকতা প্রমাণিত হইয়া গেল। অলীকপ্রকাশ "এমন কর্ম্ম আর ক'রবোনা" বলিয়া নাকে খত দেন।

এ নাটকের অভিনয় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে এবং সত্যেন্দ্র-

* প্রসিদ্ধ কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জ্যোতিরিন্দ্র নাথের জীবনস্মৃতি- পৃঃ ১৫০-১৫১।

নাথের নিজ বাড়ীতে অনেকবার অনুষ্ঠিত হয়। অলীক প্রকাশ সাজেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। প্রহসনখানি অত্যন্ত উপভোগ্য এবং অলীক বাবু ও হেমাঙ্গিনীর নভেলি ঢংয়ের কথায় উচ্চহাস্য সম্বরণ করা কাহারও সাধ্য নয়।

"হঠাৎ নবাবও" অন্যতম প্রহসন। ১৮৮৪ সালে প্রসিদ্ধ মোলিয়ারের লে বুর্জোয়া জাঁতিয়াম্ নামক প্রহসন হইতে উহা অনুদিত। ইহাও খুব উপভোগ্য। এতদ্ব্যতীত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনেক সংস্কৃত নাটক বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, যেমন, উত্তর রচিত, মালতী মাধব, মুদ্রারাক্ষস ইত্যাদি।

"কিঞ্চিৎ জলযোগ"—১৮৭২ সালে রচিত। অগ্রগতি সম্পন্ন ব্রাহ্মদের নেতা ছিলেন তখন বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেন। তিনি তখন আদি ব্রাহ্ম সমাজের বিরোধী হইয়া "ভারত আশ্রম" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই প্রহসনের নায়ক পূর্ণচন্দ্র, নায়িকা তাহার স্ত্রী বিধুমুখী। বিধুমুখী স্বাধীনা এবং 'মিরজাপুর স্যানের গির্জ্জেয়' যান। নায়কেরও চরিত্র ভাল ছিল না। স্ত্রী যে প্রচারক প্রেমনাথবাবুর সঙ্গে একাকী কথা বলেন, তাহাতে ঈর্ষা হয়। উভয়ের মধ্যে কিরূপে আবার সন্ধি স্থাপিত হয় প্রহসনখানিতে তাহা সরসভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রহসনে তখনকার ব্রাহ্মদের ব্যবহারে আবার কটাক্ষ করা হইয়াছে। এই প্রহসনখানিকে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' অশ্লীল বিবেচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলেন— *

"একেই কি বলে সভ্যতার জন্মাবধি প্রহসনের কিছু ছড়াছড়ি হইয়াছে। সেই সকল পাঠে আমরা স্থির করিয়াছি যে হাস্যরস-বিহীন প্রলাপকেই বঙ্গদেশে প্রহসন বলে। দুইখানি প্রহসন এই পরিভাষা হইতে বিশেষরূপে বর্জ্জিত,—'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং

* বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৭৯।

'সধবার একাদশী।' সধবার একাদশী অশ্লীলতা দোষে দূষিত হইলেও, অন্যান্যগুণে ভারতবর্ষীয় ভাষায় এরূপ প্রহসন দুর্লভ। "কিঞ্চিৎ জলযোগ" এই দুই প্রহসনের তুল্য নহে বটে কিন্তু ইহাকেও বঞ্চিত করিতে পারি। ইহাও একখানি উৎকৃষ্ট প্রহসন। এই প্রহসনের একটি গুণ এই যে তৎপ্রণেতা প্রহসন লিখিতে নাটক লিখিয়া ফেলে নাই। অনেকেরই প্রণীত প্রহসন, প্রহসন নহে, অপকৃষ্ট নাটক মাত্র, এ প্রহসন প্রহসন মাত্র, কিন্তু অপকৃষ্ট নহে। ইহাতে হাস্যে প্রাচুর্য্য না থাকুক নিতান্ত অভাব নাই, এবং ব্যঙ্গ যথেষ্ট···

'এই প্রহসনের আদ্যোপান্ত পাঠ বা অভিনয় দর্শন প্রীতিকর। ইহা সামান্য প্রশংসা নহে, কেননা অন্যান্য বাঙ্গালা প্রহসনে প্রায় তাহা অসহ্য কষ্টকর।"

"পরিতাপের বিষয় এই যে, এ প্রহসনের কোন কোন স্থলে এ মত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে যে ভদ্রলোক পরস্পরের সাক্ষাতে উচ্চারণ করেন না। ইহাকে অশ্লীলতা বলা যাউক না যাউক, একটু দোষ বটে। কিন্তু ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারা যায় যে, ইহাতে কদর্য্য ভাবজনক কথা কিছুই নাই। এ মত কোন কথা নাই যে তাহাতে পাঠকের বা দর্শকের মন কলুষিত হইতে পারে।"

১৮৭৩, ২৬শে জুলাই টাউনহলে ন্যাসনাল থিয়েটার কর্ত্তৃক অভিনীত হয়।

শ্রীযুক্ত অজিতকুমার ঘোষ সরোজিনী নাটক সম্বন্ধে যে কয়েকটি মন্তব্য করিয়াছেন তাহা প্রণিধান যোগ্য। (১) তিনি বলেন সরোজিনী মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটকের ভীমসিংহকে স্মরণ করাইয়া দেয়—

তাহার কথা সমর্থন যোগ্য, তবে কৃষ্ণকুমারীতে আরম্ভ, সরোজিনীতে নাট্যকলার আরও পরিপুষ্টি লক্ষিত হয়। সরোজিনী জাতীয় ভাবাপন্ন, কৃষ্ণকুমারী তাহা নয়—

(২) তিনি বলেন "সরোজিনির উপরে ইউরিপিডিসের

Iphigenia at Aulis নাটকের প্রভাব আছে"—ডক্টর সুকুমার সেনও বলেন "প্রবল সাদৃশ্য" আছে। একথা ঠিক নহে। ইফিজিনিয়া স্বেচ্ছায় প্রাণ দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সরোজিনী তাহা করে নাই। Iphigonia in Aulisএর সঙ্গে বরং মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারীর সাদৃশ্য আছে, কারণ উভয়েই—willing sacrifice—স্বেচ্ছায় আত্মদানে অগ্রসর। কৃষ্ণকুমারী বলিতেছে—

"আমি কি মৃত্যুকে ভয় করি? জীবমাত্রেই শমনের অধীন। তা এতে দুঃখ করলে আর কি হবে। জীবন কখনও চিরস্থায়ী নয়। যে আজ না মরে, সে কাল মরবে। কুলমান রক্ষার জন্য প্রাণ-দান অপেক্ষা আর কি পুণ্য কর্ম্ম আছে?" ৫ম অঙ্ক ৩য় দৃশ্য।

কিন্তু সরোজিনী নাটকে সরোজিনী যে স্বেচ্ছায় বলিদান চাহিয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই। এবং বিজয় সিংহের সহিত দেখা হইলে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করা স্থির হইল। ইফিজিনিয়া সম্বন্ধে Aristotle ও বলেন—The special characteristics of Iphigenia are that she yielded herself up as a willing sacrifice তবে লক্ষ্মণ সিংহ, রণধীর এবং বিজয় সিংহের সহিত যথাক্রমে Agmemmon, Menelius ও Achilisএর সামান্য সাদৃশ্য থাকা সম্ভব।

আর দুই একখানি নাটকের উল্লেখ করিয়া এই অধ্যায়ের শেষ করিব। এই সময়ে বর্ষার উদ্গত উদ্ভিদের ন্যায় অনেক নাটকের উদ্ভব হয়, তবে দুই একখানি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সেইগুলি সম্বন্ধে আলোচনা অবান্তর মনে করি। একখানি স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক। ইহা বরিশালে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় দুর্গাদাস কর কর্ত্তৃক রচিত হয়। দ্বিতীয়খানি বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী নিবাসী স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র দাশগুপ্তের 'অভিমন্যু বধ'। এই নাটকখানি ১২৭৯ (১৮৭২)তে রচিত। এই নাটক অনেক স্থলে অভিনীত হয়। এই

নাটক পাঠ করিবার পরে অনেকের মহাভারত পড়িতে অনুরাগ জন্মিয়াছিল। এই নাটক সুলিখিত এবং ইহার গানগুলি রুচি সম্পন্ন। এমন কি বিবাহের গানেও শ্লীলতা ছিল।

নাট্যকার লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর নন্দবংশোচ্ছেদ ১৮৭৩, কুলীন কন্যা অথবা কমলিনী (১৮৭৪) আনন্দ কানন ১৮৭৪ ও নবাব সেরাজুদ্দৌলা উল্লেখযোগ্য। প্রথম তিনখানি নাটক ন্যাসনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়।

নন্দবংশোচ্ছেদ নাটক হ্যামলেটের অনুকরণে রচিত। নন্দ এবং শশীপ্রভা হামলেট এবং ওফেলিয়ারই অনুরূপ। তবে নাটকে তাহাদের কথোপকথনে মাধুর্য্য নাই। উভয়ের একটু কথোপকথনের পরিচয় দিতেছি—

নন্দ—বিনোদিনী, রাক্ষসী আবার কে? তোমার পিতাইত রাক্ষস?

শশী। আরে! বাবা কেন রাক্ষস হতে যাবেন, আমাদের বিচক্ষণা যে রাক্ষসী তা বুঝি জাননা?

নন্দ। (স্বগত) শশীর কথায় আমার সংশয় জন্মাচ্ছে। প্রেয়সীর রাক্ষসী প্রলাপের কোন গূঢ় কারণ থাক্‌বে। (প্রকাশ্যে) বিচক্ষণা কিসে রাক্ষসী হ'ল?

"আধুনিক নাটকের অবস্থা ভাবিতে গেলে দোষ সত্ত্বেও নাটকখানি ভাল হইয়াছে বলিতে হইবে। শশীপ্রভার চরিত্র করুণ রসাশ্রিত বটে। সেই চরিত্রটি এই নাটকের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্র। রাণীর দুঃখে এবং উপসংহৃতিতে, বিলক্ষণ করুণ রস আছে। আমাদের বিবেচনায় এই নাটক অভিনীত হইবার যোগ্য।

বঙ্গদর্শন শ্রাবণ ১২৮০

কুলীন কন্যা অথবা কমলিনী সম্বন্ধেও বঙ্গদর্শনের (ভাদ্র, ১২৮১)

উক্তিই সর্ব্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য। কমলিনীর প্রেমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে শিবিকারোহণ সম্বন্ধে ইহার উক্তি—

"কুলীন কন্যাই হউন, আর বংশজ দুহিতাই হউন, যিনি এখনকার পবিত্র প্রণয়ের অনুরোধে কুলত্যাগ করেন, তিনি বিলাতের সিলিং নবেলিষ্টগণের কাছে সুখ্যাতি পাইতে পারেন; আমরা তাহার প্রশংসা করিব না।

"আর নাটকের নায়ক দিননাথ আগামী বর্ষে আইন পরীক্ষা দিবেন, তাঁহাকেও দুটা কথা বলি।

"দিননাথ (স্বগত) 'আমাদের প্রণয় অপবিত্র নয়—লালসা সম্ভূত অচির-জাতও নয়, তবে আমি কমলাকে কেন না বিবাহ করিব?'

"দিননাথের এ যুক্তিতে আমরা অনুমত নহি! আবেগ সঙ্কিক্ষণ অপরিণত বয়সে কি কেহ বলিতে পারে, কোন চিত্ত চাঞ্চল্যটি লালসা সম্ভূত অচিরজাত আর কোনটি স্বার্থ সাধন শূন্য? কেহ বলিতে পারুক আর নাই পারুক, আমরা বেশ বলিতে পারি, দিননাথ তাহা বলিতে পারেন না। দিননাথ নিতান্ত অপরিপক্ক বালক বলিলেই হয়। যে দিননাথ প্রণয়িনী বিচ্ছেদে একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়েন, যাঁহার তরল বুদ্ধি লোপ পায়, বাতুলতা আক্রমণ করে, সে দিননাথ কি আপনার চিত্তবেগ পরীক্ষা করিতে পারে? কখনই না। দিননাথ বঙ্গীয় যুবকের আদর্শ নহে। কমলিনী কুমারীবর্গের অনুকরণীয়ন নাহেন। নাটকখানিতে বিলাতী সভ্যতা প্রবিষ্ট হইয়াছে। নাটকখানি ভাল নহে।"

আনন্দ কানন বা মদনের দিগ্বিজয় একখানি গীতিনাট্য। নারায়ণ মদন রতি, অহমিকা, লীলা, সঙ্গীত অবিবেক প্রভৃতি ইহার চরিত্র।

চুঁচুড়ার নিমাইচাঁদ শীল কাদম্বরী নাটক (১৮৬৪) এঁরাই আবার বড় লোক (১৮৬৭), চন্দ্রাবতী ১৮৬৯ ধ্রুব চরিত্র ১৮৭১, তীর্থ মহিলা ১০৭৩এ রচনা করেন। বঙ্গদর্শন বলে—'ধ্রুব নাটকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট'

"স্বর্ণলতা নাটক" রচনা করেন দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭২ সালে। মনোনীত করিয়া পরিণয় প্রথা প্রচলিত না থাকায় যে কত অনিষ্ট তাহা বর্ণনার জন্য এই নাটক রচিত।

এই সময়ে নাটকের এতই ছড়াছড়ি এবং বিষয়-বস্তুও এত নীরস যে বঙ্গদর্শন উত্যক্ত হইয়া ব্যঙ্গস্বরে লিখিতে বাধ্য হয়েন—

"নাটকখানি ৯২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতএব দেবেন্দ্রবাবুর দিন কোনমতে কাটিয়া গেল। কিন্তু ভবিষ্যৎ নাটককারেরা কি লিখিবেন, তাহা ভাবিয়া আমরা ব্যাকুল হইয়াছি। আমরা তাহাদিগের উপকারার্থ ভাবিয়া চিন্তিয়া কয়েকটী বিষয় স্থির করিয়াছি—ভরসা করি—তাঁহারা ইহার মধ্যে কোন বিষয় মনোনীত করিবেন যথা বাঙ্গালী মাছ ভাত খায়, মুরগী খায় না—এই কুপ্রথায় অনেক অনিষ্ট ঘটিবে। এই নৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া "মুরগী নাটক" নামে একখানি উৎকৃষ্ট নাটক হইতে পারে। রোড্ সেস্ নাটক দুর্ভিক্ষ নাটক প্রভৃতিও স্বর্ণলতা অপেক্ষা অপকৃষ্ট হইবেনা।

'বঙ্গাধিপ পরাজয়' আর একখানি নাটক। নাট্যকারের নাম নাই।

দুর্গাদাস করের স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক রচিত হয় (১৮৬৩) ১২৭০, সালে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ ইহার বিষয় বস্তু। ঢাকার ইমামগঞ্জে সুলভযন্ত্রে মুদ্রিত হয়, এবং বরিশালে অভিনীত হয়। মূল্য ॥৵০

অন্যান্য নাটক—

হিন্দু মহিলা নাটক রচনা করেন বিপিনমোহন সেনগুপ্ত। বিষয় হিন্দুমহিলাগণের দুরবস্থা। ১৮৬৮।

নাটক পড়িয়া তদানীন্তন তিনটি বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় (১) বাঙ্গালীবাবুরা কিছু স্ত্রৈণ (২) পিতামাতাকে প্রতিপালন করিতে অনিচ্ছুক (৩) নব্য যুবকেরা (Young Bengal) পানাশক্ত।

স্পর্শানন্দ নাটক, রসরঞ্জন নাটক (বেহারীলাল) রায় রচিত

কালকৌতুক নাটক প্রভৃতি অত্যন্ত কদর্য্য নাটক। মুক্তাবলী নাটকে, [নারায়ণ ভট্টারাজ রচিত নাটকে] টেকচাঁদের ব্যঙ্গরসটি ফুটিয়াছে

"মদ খাওয়া বড় দায়
জাত থাকার কি উপায় ?"

শ্রীরমেশচন্দ্র লাহিড়ী ১২৮০ সালে গৌড়েশ্বর নাটক রচনা করেন। 'বঙ্গদর্শন' বলেন ইহা জাল রামায়ণ বা জাল অযোধ্যাকাণ্ড। রাজা দশরথ পরিণত হইয়াছেন গৌড়েশ্বর চন্দ্রকেতুতে, রামচন্দ্র সুধীরে, লক্ষ্মণ সুরেন্দ্রে—কৌশল্যা বিজয়ায়, সীতা মনোরমায়—উর্ম্মিলা সুরসুন্দরীতে। গ্রন্থকারের কবিত্ব শক্তি আছে, যেমন সুরসুন্দরী সুরেন্দ্রকে বলিতেছে—

"নাথ ! নাহি দেখিয়াছি হেন কালনিশি,
নাহি ছিল আশা দেখিব দিনের মুখ
আর ! পোহাইল যদি এ কাল শর্ব্বরী
না দিব যাইতে রণে, আজ।"

অন্যস্থানে আচার্য্য জাবালি (বশিষ্ঠ) গৌড়েশ্বরের মৃত্যুতে দুঃখ করিতেছেন :—

"দেখরে সংসার, রাজ্যসুখ। যাতে মুগ্ধ
সবে, নরপাল হারাইল প্রাণ নিজে
অপালনে ! আত্মজের বন্ধু তার নাহি
একজন ; কেহ নাহি বসিল শিয়রে
শুনাতে শেষের এ ভয়ঙ্কর দিনের আশ্রয়
রাম-নাম।"

শ্রীরাধানাথ বর্দ্ধন প্রণীত সরোজিনী নাটক ১২৭৩ সালে রচিত।

নাটকের কোন গুণ নাই। রাজা রাজরাণী, রাজপুত্র প্রভৃতি মালা, ডুলে, বাগ্দীর মত কথা বার্ত্তা কহিয়াছেন, আবার কখনও

বিশুদ্ধ সংস্কৃতের দীর্ঘ সমাসের এত ঘটা যে ভবভূতির নাটকের মধ্যে তাদৃশ দীর্ঘ সমাস দুর্লভ। স্থানে স্থানে অত্যন্ত কদর্য্য রুচির পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, গঙ্গাধরের কথাবার্ত্তা সকল অত্যন্ত নীচ প্রবৃত্তির উদ্দীপক। সে একস্থানে বলিতেছে--

"আমরা ভাই, যত বাছাবাছি করি না, আমাদের কাছে টক মিষ্টি সবই সমান, যখন যা পাই একবার চেখে নি, এই পর্য্যন্ত, আমাদের কাছে ভাল মন্দ বিচার নাই, আমরা বেশ্যা ও ভার্য্যাকে এক চক্ষে দেখি।"

পুনশ্চ—

"বাইরে ধর্ম্মাড়ম্বরের আর ইয়ত্তা নাই।......কিন্তু ভিতরে অন্যভাব। কেবল মুখ ভঙ্গিই সার, ধর্ম্মের সঙ্গে ভাসুর ভাদ্রবধূর সম্বন্ধ। বিবাহ করিনা অথচ বিবাহিত......মরাল যেমন নীর পরিত্যাগ ক'রে ক্ষীর গ্রহণ করে, আমরাও ঠিক সেইরূপ সারগ্রাহী—

কাঁটা জাল পরিহরি, সুখে তুলি ফুল
পিঁয়ি মধু বাজে নাক মৌমাছির হুল

তুমি যেমন নির্ব্বোধ তেমনি ভুগচ।"

"বোধ হয়, এই শ্রেণীর ভণ্ডদিগকে ঘৃণিত করানই লেখকের উদ্দেশ্য—কিন্তু স্বাস্থ্য-বিধি শিখাইবার জন্য কাহাকেও নরকে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য নহে। কাদা ছানিতে গেলেই কিছু গায়ে লাগে। যে নাটকের কোন নায়কের দ্বারা এই সকল কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা কাহারও পঠনীয় বা দর্শনীয় নহে।

"কবি যেখানেই করুণা, স্নেহ, প্রণয়, কোমলতা, মধুরতা প্রভৃতি অবতারণা করিতে গিয়াছেন, সেইখানেই দীনবন্ধুবাবুর নাটক সকলের নিকৃষ্টাংশের অনুকরণ মাত্র। তাহা অতি জঘন্য হইয়াছে। ......নিকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া আদর পাইবার অধিকার কাহারও নাই।"

৺শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের 'নয়শো রুপেয়া' এই সময়ের এক-

খানি উৎকৃষ্ট নাটক। তখন সমাজের একটী প্রথা ছিল যে কুলীনগণ অনেক পুরুষের নিকট অনেক টাকা পণ নিয়া মেয়ের বিবাহ দিত এবং যে পর্য্যন্ত টাকা না আদায় হইত, জামাইকে মেয়ের ঘরে যাইতে অনুমতি প্রদান করিত না। রামধন তাহার মেয়ে সরলাকে ৯০০৲ নয় শত টাকা পাইলে বিবাহ দিতে পণ করে। তাহার জ্ঞাতি ভগ্নীর পুত্র রঞ্জনই পরে টাকা দিয়া বিবাহ করিতে রাজী হয়। সরলা ও রঞ্জন পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিত। এই নাটকখানির বিস্তৃত সমালোচনা বঙ্গদর্শনে (১২৮০ বৈশাখ) বাহির হয়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"কথোপকথনের ভাষা সরল বলিয়া গ্রন্থকারের প্রশংসা করিতেছি। তবে তিনি সংস্কৃত-বাহুল্য এড়াইতে গিয়া কিছু কিছু গ্রাম্যতা দোষে পতিত হইয়াছেন।

"গ্রন্থকার যেমন শব্দাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেইরূপ অলঙ্কারাড়ম্বরও পরিত্যাগ করিয়াছেন। নাটকখানির অল্প সৃষ্টি চাতুর্য্যও আছে। সাতুলাল একটী অপূর্ব্ব জীব, গাঙ্গের নিমচাঁদ —নিমচাঁদের ছোট ভাই—সাতুলালের এতগুণ আছে যে নিমচাঁদের কাঁধে হাত দিয়া দাঁড়াইবে বড় আশ্চর্য্য নয়।...গুপ্ত গ্রন্থকারের এই খানি যদি প্রথম ফল হয়, আমাদের ভরসা হইতেছে তিনি ভাষা ও রস পরিচালনে আরো একটু শিক্ষিত হইলে তাঁহার গ্রন্থ আদরণীয় হইবে।"

অমৃতলাল বসু মহাশয়ের "চীরকচূর্ণ নাটক"ও এই সময়ের আর একখানি নাটক। তবে তাহা অমৃতলালের নাটক প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (নগেন্দ্রবাবুর নামে প্রকাশিত) গুইকোয়ার নাটক, রজেন্দ্রকুমার রায়ের প্রকৃত বন্ধু মহেন্দ্রলাল বসুর পদ্মিনী ও মিসেস সুকুমারী দত্তের "অপূর্ব্ব সতী"ও উল্লেখযোগ্য। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রহসন "কিছু কিছু বুঝি"

"ভ্যাদারে মোর বাবা" এবং কয়েকখানি যাত্রাভিনয়ের পুস্তকও উল্লেখনীয়।

এই সমস্ত নাটক ব্যতীত ১৮৭৬ সালে নিম্ন কয়েকখানি নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায়—

১। মহারাষ্ট্র কলঙ্ক—উমেশচন্দ্র গুপ্ত।

২। যৌবনে যোগিনী—গোপাল মুখোপাধ্যায়।

পৃথ্বীরাজ, মায়াবতী, মহম্মদ ঘোরি,

ভীমসিংহ, সমরসিংহ প্রভৃতি চরিত্র উল্লেখনীয়।

৩। ভারত বিজয়—রাজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৪। জয়পাল—প্রমথ মিত্র।

৫। ভারতের সুখশশী যবন কবলে (নবীন বিদ্যারত্ন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলের প্রধান পণ্ডিত)।

৬। বঙ্গাধিপ পরাজয়।

৭। প্রণয়ের প্রতিফল নাটক (মোহিনী ঘোষাল)

৮। কুমুদ কামিনী—রজনীকান্ত শর্ম্মা।

৯। প্রমোদ মনোরমা—বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

১০। হেমনলিনী—উমেশচন্দ্র গুপ্ত।

"বাজারের লড়াই" শিশির ঘোষ মহাশয়ের অন্যতম নাটক। ১৮৭৪ সালের জানুয়ারী হইতে হীরালাল শীলের সঙ্গে স্যার ষ্টুয়ার্ট হগ সাহেবের বাজার লইয়া লড়াই হয়। উক্ত বিবাদ সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঘটনাবলম্বনে এই নাটক রচিত।

উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটক

এইবার আমরা উপেন্দ্রনাথ দাসের "শরৎ সরোজিনী" নাটকখানির বিষদ্ আলোচনা করিতে চাই। প্রাক্-গিরিশযুগের ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক। ইহাতে সৌন্দর্য্য আছে, গল্পের বাঁধনি আছে, তেজস্বিতার কথা আছে, বিশুদ্ধ প্রেমের কথা আছে, কিন্তু কোনরূপ অশ্লীলতা নাই, বাড়াবাড়ি নাই, গ্রাম্যতা দোষ নাই। ইহা কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক সমস্যাবলম্বনে লিখিত হয় নাই, অথচ সাময়িক ব্যাপারের উল্লেখ প্রসঙ্গত এমন দেখা যায়, তাহা নিতান্ত অবিচ্ছিন্ন ঘটনা বলিয়াই মনে হয়। নাটকখানি সম্পূর্ণ মৌলিক; ইহাতে রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু, মনোমোহন, এমন কি অপর কোন নাট্যকারের বিন্দুমাত্র প্রভাবও পরিলক্ষিত হয় না। ইহাতে প্রেম আছে, কিন্তু প্রেমালাপ নাই, শিক্ষার প্রভাব আছে, কিন্তু শিক্ষার বক্তৃতা নাই, স্ত্রী স্বাধীনতা আছে, কিন্তু তাহা কোনরূপ ক্ষুব্ধকর-জনক নয়।

নাটকখানি ১২৮১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ১৭ নম্বর নিমু খানসামার গলি, পটলডাঙ্গা হইতে প্রকাশিত হয়। নাট্যকারের বন্ধু অমৃতবাজারের ৺হেমন্তকুমার ঘোষের নামে নাটকখানি উৎসর্গিত হয় এবং বিজ্ঞাপনে উপেন্দ্রবাবু খুব সরসতার সহিত লিখিয়াছেন—

"শরৎ সরোজিনী অতি উৎকৃষ্ট কাব্য হইয়াছে—এক বা অর্দ্ধ পৃষ্ঠা মাত্র পাঠ করিয়া অক্লেশে ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারা যায়। সর্ব্বত্র সমভূমি, লেখনীর এমন চমৎকারিত্ব যে, দুই চারি পংক্তি পড়িলেই উত্তম নিদ্রাকর্ষণ হয়। তাই বঙ্কিমবাবু দ্বারা সংশোধন করাইয়া লইবার আবশ্যক নাই।"

নাটকখানির ভিতরকার রুচি বরাবর মার্জ্জিত, অথচ তাহা স্বতঃই প্রতিভাত হইয়াছে, কোনরূপ চেষ্টা করিয়া করা হয় নাই। উপেন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় নাটক সুরেন্দ্র বিনোদিনী ইহার অব্যবহিত পরেই লেখা হইয়াছে, এই নাটকও উপেন্দ্রবাবু নিজের বলিয়া স্বীকার করেন নাই। সাময়িক সমস্ত সংবাদপত্রই উভয় নাট্য-গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেন। উপেন্দ্রবাবু নিজেও একজন সাংবাদিক এবং সমাজহিতৈষী ছিলেন। তখনকার লোকে যাহাই বলুক, আজও আমরা উক্ত নাটকের প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। অভিনয় করিতে পারিলে আজও এরূপ নাটক বিরল।

শরৎ সরোজিনীর শরৎ রিষড়ার একজন শিক্ষিত ও সংগুণান্বিত জমিদার। তাহার বয়স মোটে ২১।২৩ বৎসর। তিনি কলিকাতায় থাকেন। বাড়ীতে কর্ম্মচারীরা থাকে, আর থাকেন তাঁহার সহোদরা সুকুমারী এবং তাহার সঙ্গে পালিতা সরোজিনী। গ্রামস্থ কোন নিঃস্ব বিধবা মৃত্যুকালে সরোজিনীকে তাহার হাতে দিয়া যান। শরৎ বক্তা এবং পরোপকারী, দুঃস্থদের সাহায্য করেন, আবার ফোর্ট উইলিয়মের বিরুদ্ধেও বক্তৃতা দেন। মতিলাল কুক্রিয়াশক্ত অর্থ-গৃধ্নু মাতাল। বিনয়ের টাকাকড়ি নিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। বিনয় রিষড়ার শরতের বাড়ী আশ্রয় পায়। মতিলাল দুষ্ট লোক লাগাইয়া শরৎকে প্রহার করায়, আবার লাঠিয়াল ও শ্বেতাঙ্গ সার্জ্জেণ্ট সহ তাহার রিষড়ার বাড়ী আক্রমণ করে। শরৎ ও সরোজিনীর চেষ্টায় আততায়ীগণ প্রতিহত হয়। শরতের প্রাণ বাঁচাইতে সরোজিনী একজন সার্জ্জেণ্টকে গুলিও করে। আহত শরৎ সরোজিনীর শুশ্রূষাগুণেই আরোগ্যলাভ করে।

সরোজিনী শরৎকে ভালবাসিতে আরম্ভ করে। কিন্তু মিলনের সম্ভাবনা কম মনে করিয়া গৃহ ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হয়। এদিকে মতিলালের কুচক্রান্তে বিনয় ও সুকুমারী আবদ্ধ হয়। ভীষণ অনর্থ

হইত, কিন্তু হইতে পারে নাই, মতিলালের ভ্রাতৃবধূ ভুবনমোহিনীর জন্য। মতিলাল পূর্ব্বে ইহাকে প্ররোচিত করিয়া বিপথগামিনী করিয়াছিল। মতিলাল শরৎকে আরও ভীষণ বিপদে আবদ্ধ করিতে জাল দলিলাদির সৃষ্টি করে। কিন্তু অকৃতকার্য্য হয় শরতের বিমাতা রমাসুন্দরীর জন্য। মতিলালের হীন কৌশলেই শরৎ এতাবৎ এই বিধবার প্রতি রুষ্ট ছিল। পরে সরোজিনীর উদ্ধারও হয় ইহার নির্দ্দোষ সহৃদয়তায়। সরোজিনীর শোকে শরৎ মৃতপ্রায় হইয়াছে। সে নিজেই বালকবেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। শরৎ ও সরোজিনী, এবং বিনয় ও সুকুমারীর মিলনে নাটকের শেষ হয়। অতঃপরে রমা সুন্দরী শরতের বাড়ীতে মাতৃ-সম্মানে থাকেন।

সরোজিনীকে বুদ্ধিমতী স্থির স্বভাব করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে, সুকুমারী বুদ্ধিমতী কিন্তু সপ্রতিভা। উভয়েই শিক্ষিতা, কিন্তু শিক্ষার কোনরূপ কুফল তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় নাই। ভুবনমোহিনীর চরিত্রস্খলন হইলেও বিনয়, সুকুমারী এবং রমাসুন্দরীকে রক্ষা করিতে এবং মতিলালের কুকার্য্যের প্রতিশোধ লইতে তাহার কার্য্য-কুশলতা আশ্চর্য্য ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। মতিলালের স্ত্রী বিন্দুবাসিনীর স্বামীর প্রতি ভক্তি অকৃত্রিম এবং অচল রাখা হইয়াছে। কয়েকটি শ্বেতাঙ্গ সাহেবের অত্যাচার প্রদর্শিত হইয়াছে এবং একটি বৈজ্ঞানিকের 'মনুষ্য কপিবংশোদ্ভূত' প্রভৃতি প্রমাণের অবতারণায় আধুনিক গবেষকদিগের প্রতি একটু শ্লেষও করা হইয়াছে। "প্রণয় পরীক্ষা" নাটকের উল্লেখ আছে এবং সরোজিনীর জন্য বঙ্গদর্শন, অমৃত বাজার পত্রিকা, ন্যাসনাল পেপার, এডুকেশন গেজেট, সোমপ্রকাশ, হিন্দুপেট্রিয়ট্ প্রভৃতি সংবাদপত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। সরোজিনীর পুরুষ বেশেতে সেক্সপিয়রের প্রভাব দৃষ্ট হয়। সরোজিনী ও সুকুমারীর সম্বন্ধে শরৎকুমারের সরকার ভগবান বলিতেছে :—

"আমরা কি বল্‌তে কসুর করি মশাই? তিনি বের কথা

মোটে কাণে ঠাঁই দেন না, তার আর কি করব? নিজেরও না বোনেরও না। আর ঐ আর একটি মেয়ে, তারও না। তারও বয়েস অনেক হয়েছে, ১৭।১৮ হবে।

লোক—আচ্ছা মশাই, তাদের যে কর্ত্তে ইচ্ছে যায় না?

ভগবান—তারা কি আর বাবুকে বলবে আমাদের বে দাও। বাবুও তাদের বের নাম গন্ধ করেন না, তারাও কিছু বলে না। সে থাক্ কি জানেন মশাই, কপালের কথা, বড় মানুষ হলেও হয় না, গরীব হ'লেও হয় না। ঐ যে কথায় বলে—

যার কপালে নাইকো ঘি—
ঠক ঠকালে তার হবে কি॥

লোক—(সঙ্কেত পূর্ব্বক) বলি, মশাই, সে সব কিছু নয়তো?

ভগ—আজ্ঞে না, তা কিছু নয়। সে দিকেও না। আমি এ বাড়ীতে একাদিক্রমে প্রায় বার বচ্ছর চাকরি কচ্ছি, তা এতই কালের মধ্যে সে সব কিছু দেখিওনে, শুনিওনে। মেয়ে দুটি বড় ভাল। তবে একটু উচক্কা উচক্কা গোছ।

লোক—সে কি রকম?

ভগ—এই যার তার সঙ্গে কথা কওয়া আছে। মাথায় ঘোমটা টোমটা দেওয়া নাই। তা ওসব কি জানেন মেয়েদের লেখা পড়া শেখার ফল। তাতে আবার বাড়ীতে গিন্নী বান্নি মেয়েমানুষ ত কেউ নেই। যা ইচ্ছে তাই করে বেড়ায়। তবে মেয়ে দুটি এদিকে খুব ভাল। আমার ছোটছেলেটার যখন ব্যারাম হয়, তখন দু'জনে তাকে দু'বেলা দেখতে যেত। তা ছাড়া ওষুধ টষুদ্ খাওয়ান, বেদনা ছাড়িয়ে দেওয়া, কোলে, কোলে করে গায়ে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়ান, সকল রকম করেছে। আর দুঃখী কাঙ্গালের উপর বড় দয়া।

লোক—আচ্ছা ওরা নাকি লেখাপড়া শিখেছেন!

ভগ—খুব। বাঙ্গালা ইংরাজি দুইই। এমন কি কেতাব পর্য্যন্ত নাকি লিখতে পারে।...বামাবোধিনী অবলাবান্ধব, ডাকে আসে—তাইতে নাকি মাঝে মাঝে লেখে!

লোক—চাল চুল কি রকম?

ভগ—সে মশাই কেমন কেমন একরকম। গওনা বড় একটা পরা নেই...আল্‌তা টাল্‌তার সঙ্গে সম্পর্ক নেই।

লোক—ওঃ তবে খ্রীষ্টানি মত, বোঝা গিয়েছে

ভগ—আজ্ঞে না। গির্জ্জেয়ও যায় না, বাড়ীতে ব'সেও সুর করে চেঁচায় না, তবে একটা কথা—

লোক—কি বলুন তো—

ভগ—(মৃদুস্বরে) বলব কি, জামা গায়ে দেয়, মোজা পরে, আর কখন কখন বিবিদের মত জুতো পায়ে দেয়।

লোক—(চক্ষু বিস্তার করিয়া) আঁা—আ, আ, বলেন কি মশাই জামা গায়ে দেয়, মোজা পরে, জুতো পায়ে দেয়! হরি বল মন একবার—কালে কালে সব একাকার হল, কিছুই রইল না।

সরোজিনীর হৃদয়দ্বন্দ্ব বেশ প্রস্ফুটিত হইয়াছে, অন্যান্য চরিত্রও নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, তবে শরতের মুখে স্বাধীনতার বক্তৃতা যেন ভাসা ভাসা মনে হয়—। শরৎ বলিতেছে—

"সাবধান, ভ্রমে স্বপ্নেও স্বাধীন হতে অভিলাষ করনা—ফোর্ট উইলিয়ম্, যদি আমরা নিতান্ত স্বার্থপর ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ না হয়ে কিয়ৎপরিমাণেও মনুষ্য নামের অধিকারী হতেম, তাহ'লে তোমার এই উদ্ধত বাক্য এতদিন সহ্য ক'রতে হোতনা—

শরৎ সরোজিনী নাটক অভিনীত হয় ১৮৭৫, ১লা জানুয়ারী। মহেন্দ্রবাবু হইতেন শরৎ, সুকুমারী গোলাপ নাম্নী অভিনেত্রী এবং বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠ বিহারী দত্ত (উপেন্দ্র বাবুর বিশেষ অনুগত) সুকুমারীর ভূমিকা গোলাপ এত ভাল করিত যে অতঃপরে সকলে

তাহাকে সুকুমারী বলিয়াই জানিত। উপেন্দ্রবাবুর চেষ্টায় এই গোষ্ঠ বিহারীর সঙ্গে গোলাপের তিন আইনানুসারে বিবাহ হয়, এবং অতঃপরে সে মিসেস্ সুকুমারী দত্ত নামেই পরিচিত হইত।

'শরৎ সরোজিনী' নাটকের অল্পদিন পরেই 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' লিখিত হয়। বিনোদিনীর সঙ্গে সৌদৃশ্য আছে সরোজিনীর, আর ভগ্নী বিরাজমোহিনীর সঙ্গে সুকুমারীর। বাঁশবেড়ের জমিদার রাজচন্দ্র বসুর পৌত্রী বিনোদিনীর সহিত হুগলী নিবাসী শিক্ষিত ধনী সুরেন্দ্রের বিবাহ হইবে স্থির হয়। হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাক্রেন্ডী অত্যন্ত লম্পট ও কুক্রিয়াশক্ত ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট ছয় হাজার টাকা ধার নিয়া পরে কৌশলে হ্যাণ্ডনোট হাতে করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলে। ইহার পরে সুরেন্দ্রের সঙ্গে তাহার বিবাদ হয়। ম্যাক্রেডি সুরেন্দ্রকে জেলে দিয়া বিরাজমোহিনীকে একটা পড়ো বাড়ীতে আনিয়া তাহাকে পাশবিক আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়।

বিরাজমোহিনী উপর হইতে লাফাইয়া পড়ে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে পাঁজাকোলে করিয়া লইয়া আসে। সে সময়ে বিরাজমোহিনীর সম্মুখদিকের কাপড় রক্তাক্ত ছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট যখন বিরাজ মোহিনীকে নিয়া আসে, এমন সময় খবর আসিল হুগলী জেলের কয়েদীরা বিদ্রোহী হইয়াছে, ম্যাজিষ্ট্রেট দ্রুতগতিতে সেখানে চলিয়া যায় এবং কয়েদীদের সহিত সংঘর্ষে নিহত হয়। ইত্যবসরে রাজচন্দ্র বোসের দৌহিত্র বিরাজকে উদ্ধার করে। পরে যেমন বিনয়ের সঙ্গে সুকুমারীর বিবাহ হইয়াছিল এখানেও বিরাজের সঙ্গে সেরূপ হয়।

এইদৃশ্য অবতারণার জন্য থিয়েটারের ডিরেকটার উপেন্দ্রবাবু ও ম্যানেজার অমৃত বসুমহাশয়ের একমাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। আপিলে বিচারপতি ফিয়ার ও মার্কবীর রায়ে তাহারা মুক্তিলাভ করেন। এই সমস্ত বিষয়ই 'মৎপ্রণীত' ভারতীয় নাট্যমঞ্চে

এবং Indian Stage (Vol II) তে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এখানে পুনরুক্তি করিলাম না। ম্যাজিষ্ট্রেটের ভূমিকা গ্রহণ করিতেন অমৃতলাল বসু, বিনোদিনী বিনোদিনী, আর বিরাজ সেই সুকুমারী। ম্যাজিষ্ট্রেট চরিত্র সরসভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

নাটকের ভূমিকাটি বড়ই কৌতুক পূর্ণ। কতকটা শরৎসরোজিনীর অনুরূপ। প্রথম ছত্র কথাটী এই—"একদিন সন্ধ্যার সময় শালিকা গ্রাম হইতে কলিকাতায় আগমনকালে এই গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি।"

সোমপ্রকাশ (১২৮২, ভাদ্র ৮ পৃঃ, ৬৮৯) উপরোক্ত নাটক সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ভাবে মত প্রকাশ করে :

"উৎকৃষ্ট পদার্থ নাটককে কতকগুলি বাঙ্গালা নাটক লেখক মাটী করিয়া তুলিতেছেন। তাহাদের হইতে নাটকের যে দুর্ণাম রটিয়াছে উপেন্দ্র নাথ দাস হইতে তাহা দূর হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাহার শরৎ সরোজিনী বিদ্বজ্জনসমাজে সমধিক সম্মান লাভ করিয়াছে।...উপেন্দ্রনাথের প্রণীত নাটকের একটি বিশেষ গুণ আছে এই সব গ্রন্থে শৃঙ্গার, বীর, করুণ, হাস্যাদি রসের সমাবেশ করিয়া পাঠকদিগকে বিশুদ্ধ আনন্দ-সুখে আনন্দিত করা তাঁহার নাটক রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। তিনি নাটক রচনায় অনেকগুলি অভিপ্রেত বিষয়ে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। এদেশের স্ত্রীলোকেরা সতীত্বের সমধিক গৌরব করিয়া থাকেন। তাহার বিনোদিনী ও বিরাজমোহিনীর ব্যবহার ও কার্য্যদ্বারা তাহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইংরেজীতে সুশিক্ষিত নব্যদল যে সমধিক সাহসী ও অনেক অংশে কাজের লোক হইতেছিল, তাহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

অমৃত বাজার পত্রিকা বলে—শরৎ সরোজিনী অপেক্ষাও কোন অংশ অধিক উত্তেজক হইয়াছে। এডুকেশন গেজেট—কয়েকমাসে

শরৎ সরোজিনী নাটক উপহার দিয়া পরিতুষ্ট করিয়াছেন। এখন সুরেন্দ্র বিনোদিনা দিয়াও অধিক পরিমাণে পরিতোষ করিলেন।

সাপ্তাহিক সমালোচনা—"উপেন্দ্রবাবু যখন 'শরৎ শরোজিনী' প্রকাশ করেন, তিনি লিখিয়াছিলেন কোন পরলোকগত বন্ধু নাটকখানি সমাপ্ত করিয়া তাহার উপর মুদ্রাঙ্কণের ভার দিয়া যান। এই ভূমিকায় লিখিয়াছেন শালিকা গ্রামের কোন বটবৃক্ষমূলে এই পুস্তকখানি কুড়াইয়া পাইয়াছেন। আমরা নিশ্চয় জানি তাহার পরলোকগত বন্ধু ভূত হইয়া অভ্যাসগুণে নাটকখানি লিখিয়া বটবৃক্ষমূলে স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। এই ভূতটির উৎপাত সহ্য করিতে আমরা সম্মত আছি এবং সার রিচার্ড টেম্পোলের প্রস্তাবিত গয়ার পথে রেলওয়ে নির্ম্মাণ সম্পন্ন হইলে যদি কোন ব্যক্তি বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করিয়া তাহার নাটক লেখক ভূতটির উদ্ধার সাধন করিয়া যান তাহা হইলে কেবল আমরা নহি নাটকাভিনয় দর্শনামোদী অনেক ভূতও তাহার (ভূত উদ্ধার সাধনেচ্ছু ব্যক্তির) প্রতি যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইবে। রচনার গুণে পাঠকের পদে পদে কৌতূহল উদ্রিক্ত হইয়া থাকে। চিত্তের উত্তেজনা সাধনে নাটককারের বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে।" মধ্যস্থ (১২৮২ কার্ত্তিক) বলে "শরৎ সরোজিনীতে রস উদ্ভাবনায় নাটককারের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটকে মাজিষ্ট্রেটের বিচার, আচার ও অত্যাচার কিঞ্চিৎ রং চড়াইয়া স্পষ্টাক্ষরে চিত্রিত হইয়াছে। পাঠ করিতে করিতে শরীর রোমাঞ্চ হয় বোধকরি রঙ্গভূমিতে "সুরেন্দ্র বিনোদিনী" বিলক্ষণ সফলতা লাভ করিয়াছে ও করিবে। ...তবে এইবার গ্রন্থকারকে অনুরোধ এই বার যেন দেশহিতৈষিতা হুজুগের দলবৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত না হয়েন।"

অতঃপরে উপেন্দ্রবাবু বিলাতে গিয়া নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে সেখানে দ্বাদশ বৎসর থাকিতে বাধ্য হন। "দাদা ও আমি" সেইখানে রচিত হয়। প্রহসনখানি সুখকর হয় নাই। দাদা ধীরেন্দ্র ও ভাই

অনন্ত উভয়ের ভাবী স্ত্রীর সঙ্গে যেরূপ আলাপ করিয়াছে, তাহা বিলাতী সমাজে চলে কিনা জানিনা, তবে বাঙ্গালী সমাজে নয়। 'দাদা ও আমি' নিউ হ্যাসলেনে (বীণা ষ্টেজে) অভিনীত হয়।

অতঃপর আর একখানি নাটক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের "চাকর দর্পণ নাটক" কলিকাতা সমাচার পত্রিকা যন্ত্র হইতে ১৮৭৫ সালের ৪টা জানুয়ারী তারিখে প্রকাশিত হয়। ইহা "নীলদর্পণেরই" ঠিক অনুরূপ, তবে নাটকখানি সুলিখিত নয়। ইহার সারদা, বরদা, নৃত্যকালী, সুরমা, কেশব চক্রবর্ত্তী, মিঃ ম্যাক্লিন, যথাক্রমে 'নীলদর্পণ' নিধিরাম দেওয়ান নবীন মাধব, বিন্দুমাধব, সৈরিন্ধ্রি, সরলতা, গোপী দাওয়ান, রোগ সাহেবেরই রূপান্তর মাত্র। এই নাটকখানিই অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ণে Dramatic Performances Control Bills সরকারের প্রধান আয়ুধ হয়। অভিনয় নিয়ন্ত্রণ বিল আইন সভায় উপস্থাপিত করিবার সময় ভারত সরকারের আইন সভ্য মিঃ হবহাউস এই নাটকখানি সম্বন্ধে বলেন—

"......The work was an outrageous calumny as could possibly be conceived. Its object was to hold up as monsters of iniquity the class of tea-planters and all persons engaged in promoting emigration to the tea-planting districcts that was to say, men as respectable as any other body of men in the empire. ....These gentlemen have been represented as indulging in the basest of passions—cruelty, avarice and lust."

'চাকর দর্পণ' নাটক মনোমোহন গোস্বামীর "সংসার" নাটকেরও অনুরূপ। ইহার পরিচয় সংক্ষেপে দিতেছি—

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য।—

সারদা বরদা দুইভাই জমিতে ফসল না হওয়ায় নিজেদের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতেছে। জমিদারের খাজনা দিতে পারিবে না, গয়নাগাঁটি সব বিক্রয় করিয়া আহার জোগাইয়াছে এখনতো একেবারে নিরুপায়। নিকটবর্ত্তী কোন দয়ালু জমিদাদের এলাকায় চলিয়া যাইবার পরামর্শ করে, এমন সময় চা-কর সাহেবদের ঠিকাদার কেশব চক্রবর্ত্তীর আসিয়া শ্রীহট্য ও কাছাড় জেলায় চা-পাতা তুলিবার কাজের কথা বলে এবং মাসে প্রত্যেকে খোরপোষবাদে দশটাকা করিয়া পাইবে বলে। নৌকাপথে যাইবার কথা শুনিয়া ভীত হইলে চক্রবর্ত্তী খুব সাহস দেয়। সারদা বরদা পরিবারের সঙ্গে পরমর্শ করিবে বলিয়া কেশবকে বিদায় দেয়।

দ্বিতীয় দৃশ্যে কেশব ও হরিদাস সরকারের কথোপকথন ও তাহাদের কার্য্যের আলোচনা। তৃতীয় দৃশ্যে সারদার স্ত্রী নৃত্যকালী ও বরদার স্ত্রী সুরমা স্বামীর সঙ্গে কাছাড় ও শ্রীহট্য যাইতে রাজী হয়। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে হরিদাস সরকার উক্ত চারিজন কুলীকে কেশবের কাছে নিয়া আসে। কেশব তাহাদের নাম রেজিষ্ট্রি করিয়া তাহাদিগকে নৌকাযোগে পাঠাইয়া দিতে স্বীকৃত হয়।

দ্বিতীয় দৃশ্যে সারদা ও বরদাকে ইনস্পেকটার সাবধান করাইয়া দেয় যে না পলাইলে তাহাদের আর ফিরিবার আশা নাই, সাহেবেরা প্রহারে হাত ভাঙ্গিয়া দিবে। কিন্তু সরকার আসিয়া তাহাদের পলায়নের সঙ্কল্প ভাঙ্গিয়া দেয়।

তৃতীয় দৃশ্যে সারদা, বরদা ও তাহাদের স্ত্রী চা বাগানে পাতা তুলিতেছে। মাধব ও শ্যামা বহুদিন যাবৎ বাগানে আছে, দুর্দ্দশা ও প্রহারের কথা বলিয়া দেয়। নিধিরাম দেওয়ান লম্বা বেত লইয়া আসিয়া ধমকায় ও বরদার স্ত্রীর সৌন্দর্য্য ও যৌবন দেখিয়া সাহেবের কাছে উপহার দিবে বলিয়া স্থির করে। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম

দৃশ্যে ম্যাকলিন সাহেবের ঘরে সে অর্দ্ধ ইংরাজী অর্দ্ধ বাঙ্গালায় কথা বলিতেছে। নিধু আসিয়া সেলাম করে, প্রথম সাহেবের খুব চটা ভাব দেখা যায়, তারপরেই কি একটা কাজ করিবে বলায় তাহার বেতন পঞ্চাশ হইতে একশত হইবার প্রতিশ্রুতি হয়।

দ্বিতীয় দৃশ্যে নিধিরাম আসিয়া নৃত্যকালী ও সুরমার সঙ্গে তাহাদের বাসায় আলাপ করে ও অনেক আশা দেয় ও প্রলোভন দেখায়।

তৃতীয় দৃশ্যে নিধিরাম উভয়কে লইয়া সাহেবের কাছে আসে। নৃত্যকালী চলিয়া আসে, সুরমা থাকিয়া যায়। নিধু আসিয়া আলাপ করে এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই সুরমা এলোচুলে অসংলগ্ন কাপড়ে কাঁদিয়া আসিয়া বলে "দিদি আর আমাকে বোন বোলে ডেকো না এজীবনে আর তোমার বোন হতে পারবো না"— তারপর নিধিরামের দিকে চাহিয়া তাহাকে গালি দিয়া বলে, "হাঁড়ির পো। তুই না বলেছিলি সাহেব বকসিস্ দিবে, আর মুখপোড়া আমার ইজ্জত মারলে"—কাঁদিতে কাঁদিতে সুরমা মৃতাবস্থায় পড়িয়া যায় ও তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। নৃত্যকালী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে থাকে "আমি এই পোড়া মুখ কি ক'রে পাঁচজনকে দেখাব।"

চতুর্থ অঙ্কের একটি মাত্র দৃশ্য—

সারদা বরদা সাহেবের বিরুদ্ধে নালিশ করিবে বলিয়া ভয় দেখায়। সাহেব নৃত্যকালীকে চায় এবং একটা ধস্তাধস্তি হয়। উভয় ভ্রাতা পালাইয়া যায়। সাহেব কুকুর লেলাইয়া দেয়, কিন্তু নিধু মাগী আনিতে না পারায় ভয়ানক রাগিয়া যায়।

পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য—

সারদা বরদাকে সমুদ্রের মধ্যে একটা দ্বীপে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে নৃত্যকালীর উন্মাদ অবস্থা তাহার শেষ কথা

'তুই আমার ধর্ম্ম নষ্ট করবি, তা কিছুতেই হতে পারে না'—অবশেষে একখানা বঁটী সে নিজের গলায় বসাইয়া দিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

গবর্ণমেন্ট অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করিবার পূর্ব্বে এই নাটক খানি অজুহাত ধরেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহা অজুহাত মাত্র। ইহা অভিনীত হয় নাই। গজদানন্দ, হনুমান চরিত্র এবং পুলিশ অব পিগ্ এণ্ড সাপ প্রভৃতি প্রহসনের অভিনয়েই সরকার চটিয়া যায়। বিশেষতঃ গুরুবিক্রম, সরোজিনী, শরৎ সরোজিনী—প্রভৃতি উদ্দীপনাময় অথচ সুলিখিত নাটকের অভিনয়েই 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' পাশ করিতে গভর্ণমেণ্ট বদ্ধ পরিকর হয়।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হয়, এবং উহাতে যেমন নাট্যকলার উন্নতি ব্যাহত হইল, নাটক রচনায়ও খুবই শঙ্কা ও শিথিলতা আসিল।

'ভারতমাতা' একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে মুদ্রিত হয়।

সমগ্র কবিতাটি পাঠকের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিলাম। কবিতাটি স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় বিরচিত। কবিতাটি এখানে প্রদত্ত হইল—

"বামকরে কর করিয়া স্থাপিত
মুখশ্রী রয় নিশাযে জড়িত
আবৃত পুন সুধাকর সম
মলিন মুখশ্রী নিরুপম রম
কেশ পাশ আলুলায়িত
মুদিত নয়ন শূন্য বাহ্য জ্ঞান
ম্লান জীর্ণ ছিন্ন বস্ত্র পরিধান
হস্তে দুই গাছি লৌহের বলয়
দুঃখিনী দুর্ম্মনা বসি নিরাশ্রয়
মূর্ত্তিমতী চিন্তা যেন শোভিত।

২

সন্তান কয়টি নিকটে ঘুমায়
বিছানা বিহনে পড়িয়া ধূলায়
অস্থিচর্ম্ম সার সবারি দেহ
তেজোহীন শুষ্ক বিবর্ণ বদন
পরিধান মাত্র মলিন বসন
জাগায় যে কাছে নাহিক কেহ।

৩

সহসা আকাশে চপলা চমকে
ভাসে দশদিশ আলোকে পলকে
সে আলোক মাঝে বাজে কমলিনী
কমলা চরণা কমল মালিনী
কমল যুগল কমল করে
দুখিনীর মুখপানে চাহিয়া
দৃক্‌পাত নাই দেখি কাঁদিয়া
কহিতে লাগিলা কাতর স্বরে।

৪

ম্লান মুখচন্দ্র ভারত তোমারি
হেরি দিবানিশি ঝরে নেত্রবারি
যে বদন কান্তি বরষিত শান্তি
আজি তা কেমনে এমন নেহারি।
দুঃখ পারাবারে নিরখি তোমারে
হৃদয়ে ধৈরজ ধরিতে না পারি।

৫

মধুর বচন করিয়া শ্রবণ
চকিতা দুখিনী ফিরায় নয়ন

অমৃত ভাষিনী তরুণী পানে
অদৃষ্টের ফের হায় দৃষ্টি হারা
পূর্ব্ব তেজস্বিনী নয়নের তারা
কিছুনা হইল জ্ঞানের উদয়
পুন কমলিনী ভাব সুধাময়
বর্ষিলা মধুর মধুর তানে।

৬

দেখো গো ভারতি তোমার সন্তান
ঘুমায়ে রয়েছে সবে হতজ্ঞান
বলবীর্য্যহীন, অন্নবিনা ক্ষীণ,
দুর্দ্দশা দেখিয়া বিদরেগো প্রাণ
হেরিতে না পারি এদশা তোমার
বিদরিয়া বুক যায়গো আমার
হইয়া অপার জলনিধি পার
চলিলাম আজি ত্যজি এই স্থান।

৭

দুঃখিনী আবার চাহিলা চকিতে
কিন্তু সংজ্ঞা তাজে না হইল চিতে
হেরিয়া চপলা অদৃশ্য হইল
অমনি আলোক মালিকা নিভিল

৮

কতক্ষণ পরে আর্ত্তনাদ করি
উঠিলা দুঃখিনী যেন চোরে হরি
লয়ে গেছে তার মাথার মণি
সন্তান গণেরে চান জাগাইতে
আলস্তে কেহই না চাহে উঠিতে
যে জাগে সে পুনঃ চায় ঘুমাইতে
করেন জননী রোদন ধ্বনি।

৯

অবশেষে জাগি উঠিল সকলে
কি খাব জননী ক্ষুধাভরে বলে
কহিলেন মাতা 'কি বলিব' হায়
গিয়াছেন লক্ষ্মী ছাড়িয়া আমায়
অন্ন আর কোথা পাইব এবে।
কমলা এখন সাগরের পারে।
বিরাজে মহারাণীর আকারে
অন্ন কর বাছা তাঁহারে সেবে।

১০

জয় মহারাণীর জয় জয় জয়
বিপদ সময়ে কেহ না আশ্রয়
হতাশ হইয়া হৃদয় ভরিয়া
কহিল কাতরে তনয় চয়।

১১

হেন কালে শ্বেত কান্তি একজন
কোপে জমদগ্নি আরক্ত বদন
বিদ্রোহী বলিয়া ভর্ৎসিয়া গর্জিয়া
পদাঘাত করে নিষ্ঠুর অন্তরে
সন্তানগণের গায়।
হেরিয়া দুঃখিনী আর্য্য ক্ষত্র ভূমি
কাঁদি বলে 'বিধি কোথা আছ তুমি
ছাড়িলেন লক্ষ্মী আমায় যে কালে
কেননা গেলেম ডুবিয়া পাতালে
কোথায় হরিশ, কোথায় গিরিশ
কোথা ফেলি গেলি মায়।

এই কবিতাটির উপর ভিত্তিতে একটী মাত্র দৃশ্যের অভিনয় হইত। সাহেবের পদাঘাত খাইয়া ভারত সন্তানগণ যখন কাঁদিতে থাকেন, ভারতমাতা 'কোথায় হরিশ', কোথায় গিরিশ' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। এমন সময়ে অপর একজন শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ আসিয়া প্রথম সাহেবের গলা টিপিয়া তাহাকে ইংরাজ জাতির কলঙ্ক বলিয়া পদাঘাত করিলেন। পরে ভারতমাতাকে সম্বোধন করিয়া বলেন "মা, দুঃখ করোনা, তোমার দুঃখের রজনী শীঘ্রই শেষ হবে। ইংলণ্ডের ফসেট টরেন্স ভারত সন্তানগণের দুঃখ দূর কর্ত্তে প্রাণপণ যত্ন ক'রে থাকেন। মহামতি লর্ড নর্থব্রুক গভর্ণর জেনারেল হয়েছেন তিনিই তোমাদের দুঃখ দূর করবেন।" অতঃপর ধৈর্য্যের প্রবেশ—তার পরে ঐক্যতার, ইনি বলেন "আমার আশ্রয় গ্রহণ কর, এক হও, ভারত জননীর দুঃখনাশ ব্রতে ব্রতী হও—

"কেন ডর ভীরু কর সাহস আশ্রয়
যতোধর্ম্ম স্ততো জয়
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল ঐক্যেতে পাইবে বল
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে
কি ভয়, কি ভয়?"

এই বলিয়া ঐক্যতার প্রস্থান এবং যবনিকা পতন।

এই রূপকখানি প্রকাশিত হয় কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে। এই রূপকটি সম্বন্ধে স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন—

"এই সময়ে আমরা ন্যাসনাল থিয়েটারে ভারত মাতা ব'লে একটা ছোট খাটো দৃশ্যকাব্য দিলেম। এই ভারতমাতার অভিনয় বড়ই শুভক্ষণে হয়েছিল। সাধারণে বিষয়টি বড় এপ্রিসিয়েট করলে। ভারতমাতার ক'খানা প্রচলিত গান ছিল। সেগুলার আদর খুব বেড়ে গেল।"

'বঙ্গদর্শন' ইহার সমালোচনায় বলেন—"রূপকটি মন্দ হয় নাই। ঐক্যতার পরিবর্ত্তে ঐক্য হইলেই ভাল হয়।"

প্রমথ নাথ মিত্রের দুইখানি নাটক উল্লেখযোগ্য। প্রথমখানি নগনলিনী। ইহা ১৮৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী গ্রেট ন্যাসনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। একজন দুর্ব্বৃত্ত ভীলসর্দ্দার এক রাজপুত কন্যাকে অপহরণ করে। কিরূপে তাহার উদ্ধার হয়—তাহাই নাটকের বিষয়।

দ্বিতীয় নাটক জয়পাল—১৮৭৬ সালে রচিত। সুলতান মামুদের সঙ্গে জয়পালের যুদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে রচিত। নাটকের কাহিনীতে বেশ রোমান্স আছে। জয়পালের কন্যা স্বর্ণকুন্তলা যাহাকে ভাল বাসিয়াছিলেন সে ছিল পুরুষের ছদ্ম বেশে নারী। জয়পালের ভ্রাতুষ্পুত্রী জয়পালের রাজমহিষী ও স্বর্ণকুন্তলার অগ্নি প্রবেশে কতকটা জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী' নাটকের ছায়াপাত হইয়াছে। নাটকখানি অভিনীত হয় নাই।

'বীরকলঙ্ক' নাটক প্রমথনাথের অসমাপ্ত রচনা।

চতুর্থ অধ্যায়

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব

১৮৭৬ সালে 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' পাশ হইয়া গেলে যে অন্ধকার যুগ আরম্ভ হয়, তারপরে রঙ্গমঞ্চে অবস্থাও যেমন শোচনীয় হইয়া পড়ে, নাটকের গতিও বিশেষ ভাবে প্রতিহত হয়। গিরিশবাবু সে সময়ে ন্যাসনাল থিয়েটারের ভার গ্রহণ করেন, কিন্তু নাটক পাওয়া দুষ্কর হইল। অতঃপরে গিরিশবাবু নিজেই নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। যে সাধনায়, অধ্যবসায় ও প্রতিভায় তিনি পরে নাট্য সম্রাট ও মহাকবি গিরিশচন্দ্রে পরিণত হন, পাঠকবর্গের সেই ইতিহাস ও তত্ত্ব অবগত হওয়া বিশেষ কর্তব্য।

১৮৬৭ সনে গিরিশের বয়স যখন ২২।২৩ * বৎসর বাগবাজারের বোসপাড়ায় একটি যাত্রার দলে গিরিশচন্দ্র শর্মিষ্ঠার অভিনয়ের প্রয়োজনা করেন। বাধ্য হইয়া সেখানে গিরিশচন্দ্রকে কয়েকখানি গান রচনা করিতে হয়।

দেবযানীকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া যযাতির (সখি ধর ধর সুরে) গানটি গাহিতে হইত। গানটি এই—

"আহা ! মরি ! মরি !
অনুপমা ছবি মায়া কি মানবী
ছলনা বুঝি করে বনদেবী !
রঞ্জিত রোদনে বদন অমল
নয়ন-কমলে নীর ঢল ঢল,
নিতম্ব চুম্বিত বেণী আলোড়িত
বিমোহিত চিত হেরি মাধুরী।" ইত্যাদি

---

* গিরিশচন্দ্রের 'জীবন চরিত' ও 'গিরিশ প্রতিভা' দ্রষ্টব্য।

এইরূপ আরও কয়েকটি গান সংযোজিত হয়। অভিনয় ব্যাপারে ইহাই গিরিশচন্দ্রের প্রথম রচনা।

সকলেই অবগত আছেন 'সধবার একাদশী'ই ন্যাশনেল থিয়েটারের অঙ্কুর।* এই অভিনয়ে গিরিশচন্দ্রের অভিনয় খ্যাতি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এখানেও গিরিশের কিছু নূতন রচনা করিতে হয়।

দীনবন্ধু সংস্কৃত নাটকের আদর্শ ত্যাগ করিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য প্রথার অনুসরণে তাঁহার নাটক রচনা করিতেন। তাঁহার কোন নাটকেই সূত্রধার প্রস্তাবনা অথবা নীতি বাহুল্য নাই। কিন্তু সাধারণ রুচি তখনও কিয়ৎ পরিমাণে প্রাচীন সনাতন পদ্ধতির অনুবর্ত্তী ছিল। যাত্রা এবং কবি ও পাঁচালীর উপর অনুরাগের হ্রাস হইলেও লোকে গান শুনিতে বিশেষ ভালবাসিত। গিরিশ সাধারণ রুচির অনুসরণ করিয়া সধবার একাদশীতে একখানি প্রস্তাবনা এবং নাটকীয় সংস্থাপন উপযোগী কয়েকটি গীত রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ১৮৬৮—৬৯ সালের কথা। মনোমোহন বসুও গিরিশের এই প্রথাই অনুসরণ করিয়াছেন। 'সধবার একাদশী' অভিনয়ে গিরিশ রচিত কয়েকখানি গানের নমুনা দিতেছি—

কাল কোকিল তানে প্রাণে হানে শর
প্রেমে আকুল ধাইল কত মধুকর

দ্বিতীয় গানে নকুলেশ্বরের উক্তি—

মদিরা তোমার সঁপেছি প্রাণমন।
মাতাল মোহিনী, অশেষ রঙ্গিনী
তরঙ্গিনী বিবিধ বরণ॥

*Sadhabar Ekadashi is the germ of the National Theatre
—Amritalal Bose

হ'লে প্রবীণা হও নবীনা

তোমার তভই বাড়লো যৌবন

মরি কি মাধুরী, জাননা চাতুরী

সম সবে কর বিনোদন ॥

এইরূপ কয়খানি গান সংযোজনে সধবার একাদশী আরও জনপ্রিয় হইয়া উঠে !

গিরিশ সম্প্রদায় কিছুদিন পরে যে দীনবন্ধুর, 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' অভিনয় করে ; তাহাতেও গিরিশচন্দ্রই স্বরচিত নিম্ন প্রস্তাবনাটি নিমচাঁদ বেশে আবৃত্তি করেন—

"মাত্‌লামীটে ফুরিয়ে গেল, দেখুন বুড়োর রং

বাসর ঘরে টোপর প'রে কিবা বিয়ের ঢং

আয়না নসে রতা কোথা যা পারিস্ তা বল্

ক্ষমা করবেন দোষ রসিক মণ্ডল

আস্‌ছে এবার ছোঁড়ার দল' ভুবনো নসে রতা

সভ্যগণ নমস্কার, ফুরাল আমার কথা ॥"

ইহার পরে ন্যাসনাল থিয়েটার স্থাপিত হয়, এবং লীলাবতী নাটকের অভিনয়েও গিরিশচন্দ্র পূর্ব্ববৎ কয়েকখানি গীত রচনা করিয়া দেন, এবং তন্মধ্যে দুইখানি নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথম গীত

হর শঙ্কর, শশিশেখর, পিনাকী ত্রিপুরারে

বিভূতি ভূষণ, দিক-বসন, জাহ্নবী জটাভারে

অনল ভালে মদন দমন, তরুণ অরুণ কিরণ নয়ন

নীলকণ্ঠ রজত-বরণ, মণ্ডিত ফণী-হারে

উক্ষারূঢ়, গরলভক্ষ্য, অক্ষমালা শোভিত বক্ষ

ভিক্ষা-লক্ষ্য, পিশাচ-পক্ষ, রক্ষক ভবপারে ॥

এই গানটি পরে 'লক্ষ্মণবর্জ্জন' নাটকে সংযোজিত হয়, এবং দ্বিতীয় গানটি হয় 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকে—

ব'সেছিল বঁধু হেঁসেলের কোণে
বল্লেনা ফুটে, খামকা উঠে—
হামা দিয়ে গিয়ে সেঁধুলো বনে
সাঁজে সকালে, ফেরে চালে চালে
(আহা) পগার পারে বঁধু যেত এখানে।

অতঃপর ন্যাসনাল থিয়েটার যখন সাধারণ [Public] থিয়েটারে পরিণত হয় ১৮৭২, ৭ ডিসেম্বর, গিরিশচন্দ্র তখন মতপার্থক্য হেতু তাহাতে যোগদান করেন নাই। কিন্তু আড়াইমাস মধ্যে শিষ্য ও সহচরবর্গ তাঁহাকে লইয়া আসেন। ১৮৭৩, ১০ মে গিরিশ-রূপান্তরিত কপালকুণ্ডলা অভিনীত হয়। উপন্যাস নাটকান্তরিত নাটকের গিরিশচন্দ্রই প্রথম প্রবর্ত্তক।

গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। গিরিশ নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করেন বটে, কিন্তু অভিনয় কালেও পাণ্ডুলিপি খানি অসম্পূর্ণাকারে অর্পিত হইয়া যায়। মহলাও শুরু হল বটে, কিন্তু অভিনয়ের পূর্বে মহেন্দ্র সরকার যিনি নবকুমারের ভূমিকা গ্রহণ করেন, গিরিশচন্দ্রকে বলেন "আপনি পুস্তকখানি ধরিয়া যেখানে যেমন প্রয়োজন বলিয়া যান, আমরা সেইরূপই বলিব। অভিনয় সেইরূপই হইল, গিরিশ অন্তরালে থাকিয়া বলিয়া দিতে লাগিলেন, দর্শকগণ কেহ কোন বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না।

ইহার পরে গিরিশচন্দ্র সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসিদ্ধ উপন্যাস মৃণালিনী নাটকান্তরিত করেন। এই ন্যাসনাল থিয়েটারে উহার অভিনয় হয় ১৮৭৪, ১৪ ফেব্রুয়ারী। এই রূপান্তরিত নাটকেই বেশ পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় যে কালে গিরিশচন্দ্র শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে পরিণত হইবেন।

গিরিশচন্দ্র কারাগারে পশুপতির অনুতাপ খুবই মর্ম্মস্পর্শী করেন। পশুপতি অনুতাপ করিতেছে—

"রাজ্যনাশ…কারাবাস—কর্ম্মদোষে আমার সকলই উপস্থিত। কিন্তু আমি কেমন ক'রে মনোরমাকে বিস্মৃত হ'ব! মনোরমা, তোমার জন্য সব, তোমার কথা না শুনে আমি সব হারালুম। কিন্তু তোমা হারা হ'য়ে কি পশুপতি জীবন ধারণ ক'রতে পারে? কে বলে —পৃথিবী দুঃখময়। পৃথিবীতে এমন কি দুঃখ আছে যে পশুপতিকে পীড়িত ক'রতে পারে? নরক যন্ত্রণা, উদয় হও! পশুপতির পাপের শাস্তি বিধান কর। নরকে কি এরূপ শাস্তি আছে—পশুপতির উপযুক্ত শাস্তি কি নরকে আছে? আমার অন্তঃকরণ অপেক্ষা কি নরক ভীষণ? শত শত নরক একত্রিত করো—আমার আমার অন্তকরণের নিকট তারা পরাস্ত হবে। আত্মীয় স্বজন-শোণিতে চরণ প্রক্ষালন করেছি—তথাপি কি পশুপতির হৃদয়ে স্নেহের উদয় হয়? স্নেহ, তুমি বৃক্ষশাখ অবলম্বন করো—পাষাণে বাস করো, পশুপতির হৃদয়ে তোমার স্থান নাই।"

অতঃপরে উন্মাদ ভাবে পশুপতি বলিতেছে—

"মন্ত্রীবর বল দেখি, পা রাখি কোথায়? এই দেখ ভ্রাতৃবৃন্দের শোণিতাক্ত চরণের ভার মেদিনী আর বহন ক'রতে পাচ্ছে না। বল দেখি পা রাখি কোথায়?"

মন্ত্রীবর—একি পশুপতির গৃহে কে অগ্নি দিলে বোধ হয়—সৈন্যেরা লুট করতে করতে অগ্নি দিয়েছে।

পশুপতি—মন্ত্রীবর প্রজারা এদিকে আসছে কেন? তাদের বলো আজ অভিষেক নয়—অধিবাস। মনোরমা কোথায়? সে আমার সঙ্গে অধিবাস করবে। মনোরমা কোথায় গেল?--এ্যাঁ কোথায় গেল? আমার গৃহে আছে—ঐ কি আমার গৃহ—

মহম্মদ—হ্যাঁ—তোমার গৃহ

পশুপতি—"হ্যাঁ আমারই গৃহ বটে! আগুন দিয়েছে (সহসা উন্মত্তাবস্থায়) মনোরমা যে গৃহে আছে, ছাড়ো—ছাড়ো"—সবলে হাত ছাড়াইয়া ধাবিত হইলেন।

এই দুইটি রচনা ও পূর্ব্বোল্লেখিত সঙ্গীতে বুঝিতে পারা যায় যে নাটক সৃষ্টি করিবার মত প্রতিভা প্রথম হইতেই গিরিশচন্দ্রের ছিল। 'মৃণালিনী'র পরে দুইবৎসর গিরিশচন্দ্র গ্রেট ন্যাসনেলের সহিত অন্য কোন সংশ্রব রাখেন নাই—আসিতেন যাইতেন মাত্র। তবে অনুরুদ্ধ হইয়া মাউসি, Charitable Dispensary, ধীবর ও দৈত্য, আলিবাবা, দুর্গাপূজার পঞ্চরং, Circus Pantomime, সহিস হইল আজি কবি চুড়ামণি, যামিনী চন্দ্রমাহীনা ও গোপন চুম্বন (A Kiss in the Dark) প্রভৃতি কয়েকখানি ক্ষুদ্র রঙ্গনাট্য এবং প্রয়োজন মত অন্যান্য নাটকাদিতে গান বাঁধিয়া দেন। এই সব রচনায় গিরিশচন্দ্রের সমধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পায়।

তারপরে আসিল সেই অন্ধকার যুগ—গ্রেট ন্যাসনাল থিয়েটার যখন বন্ধ হইল, গিরিশচন্দ্র ইহার ভার গ্রহণ করিলেন। এবং স্বয়ংই মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য নাটকান্তরিত করেন। পলাশীর যুদ্ধেরও এইরূপ রূপান্তর করিয়া অভিনয় করেন।

ইহার পরে তিনি ১২৮৪ সালের শারদীয় পূজোপলক্ষে 'আগমনী' ও "অকাল বোধন" রচনা করেন। পূর্ব্বের রঙ্গনাট্যগুলিকে তিনি গণনার মধ্যেই ধরেন নাই, আগমনীই তিনি প্রথম রচনা-কুসুম মনে করেন। ইহার পরে বিষবৃক্ষ ও দুর্গেশনন্দিনী নাটকান্তরিত করিয়া

• শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই রঙ্গনাট্যখানি আবিষ্কার করিয়া ১৩৪২ চৈত্র 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার চরিত্রাবলি মুরারীবাবু, মথুরবাবু, গদা ও বসন্তকুমারী। ব্রজেন্দ্রবাবু এই আবিষ্কারের জন্য আমাদের ধন্যবাদার্হ।

দেন। এই সমস্ত রচনাই গিরিশবাবুর প্রথম যুগের রচনা। আগমনী দুইটি দৃশ্য বিশিষ্ট একখানি পৌরাণিক গীতিনাট্য; ইহার পাত্র মহাদেব, উমা, গিরিরাজ, মেনকা, নন্দী ও ভৃঙ্গী। দৃশ্য দুইটি গদ্যে লিখিত, কিন্তু ১৩খানি সঙ্গীত ইহাতে সংযোজিত।

একখানি গান যথা—

"তুমি ত' মা ছিলে ভুলে
আমি পাগল নিয়ে সারা হই।
হাসে কাঁদে সদাই ভোলা
জানেনা মা আমা বই॥
ভাং খেয়ে মা সদাই আছে
থাক্‌তে হয় মা কাছে কাছে
ভাল মন্দ হয়গো পাছে
সদাই মনে ভাবি ওই
দিতে হয় মা মুখে তুলে
নয় তো খেতে যায় গো ভুলে
খেপার দশা ভাবতে গেলে
আমাতে আর আমি নাই।"

দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ হইল যখন গিরিশচন্দ্র প্রতাপ জহুরীর ন্যাসনাল থিয়েটারে পুরোপুরি ম্যানেজার হইয়া যোগদান করিলেন। নাটক সংগ্রহ ও রচনা করা, ইহার প্রয়োজন করা, যাবতীয় কার্য্যের তত্ত্বাবধান করা সব কাজের ভারই তিনি গ্রহণ করিলেন।

প্রথমে এখানে 'মহিলা কাব্য' প্রণেতা সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের "হামির" নাটক অভিনীত হয় (১৮৮১, ১লা জানুয়ারী)

এই নাটক টডের রাজস্থান অবলম্বনে রচিত। হামির রাণা লক্ষ্মণ সিংহের পুত্র অরুসিংহের ঔরসজাত সুত। নাটক তখনও মুদ্রিত

হয় নাই। নাট্যকারের ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের নিকট হইতে আনাইয়া অভিনয় করেন। ইহার চরিত্র উদয় ভট্ট, বিলনদেব, জালমন্ত্রী, কমলা, লীলা ও পান্না। নাটকখানি সাধারণ শ্রেণীর। নাটকে গান ছিলনা, পদ্মিনীর গীত বলিয়া একটি সুদীর্ঘ কবিতা ছিল মাত্র। তিনি নিজে চারিখানি গান বাঁধিয়া ইহাতে সংযোজিত করেন। ইহার পরে তিনি মায়াতরু, মোহিনীপ্রতিমা ও আলাদিন তিনখানি গীতিনাট্য রচনা করেন।

নাটকের অভাবই সর্ব্বদা অনুভূত হইতে লাগিল। দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থগুলি পুরাতন হইয়া গিয়াছে, বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিও প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। গিরিশ নূতন নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞাপন দিলেন, কিন্তু মনোমত নাটক আসিলনা। এবার গিরিশ নিজেই নাটক রচনার সঙ্কল্প করিলেন। এক কথায় বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়।

গিরিশের সর্ব্ব প্রথম নাটক 'আনন্দরহো' বা আকবর। ইতিহাস ইহার ভিত্তি। রাণা প্রতাপ সিংহের সহিত আকবরের যুদ্ধ সংক্রান্ত সন্ধি প্রস্তাব প্রভৃতি কথা ঐতিহাসিক। মানসিংহকে বিষ দেওয়ার চক্রান্তও কাল্পনিক নয়। কিন্তু বেতাল চরিত্রকে এমন প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে যে ইহাকে ঠিক ঐতিহাসিক নাটক বলা চলেনা। বেতাল চরিত্রে ইচ্ছাশক্তির প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করিলেও, এখন পর্য্যন্ত গিরিশের গুরুলাভ হয় নাই। এ অবস্থায় বেতাল চরিত্রের মর্ম্ম সাধারণের বোধগম্য হইলনা। এই সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অশ্রুমতী নাটক অভিনীত হইতেছিল, গিরিশচন্দ্র বেতাল চরিত্র সৃষ্টি করিয়া একটু নূতনত্ব দিলেন, কিন্তু তাহা সাধারণে গৃহীত হয় নাই। তাঁহার মানসিক ভাবও তখন যেমন কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন, নাটকের কায়াও তেমনি প্রকৃতভাবে গঠিত হয় নাই। পাত্র পাত্রীগণ কেহই সুস্পষ্ট মূর্ত্তি লইয়া আমাদের সম্মুখে

উপস্থিত হয় নাই। তাঁহার প্রথম নাটক কি রচনা কি অভিনয়ের দিক্ দিয়া ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল। 'ভারতী' মাসিক পত্রে বিজ্ঞবর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া অবশেষে লেখেন "গিরিশবাবুর লেখায় আমরা এরূপ কল্পনার অরাজকতা আশা করি নাই।"

অতঃপরে গিরিশবাবু পৌরাণিক নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন :

"যত জাতির যত উচ্চ গ্রন্থ আছে, সকলই Mythological—অর্থাৎ পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনের লিখিত। পৌরাণিকগ্রন্থ অবলম্বনে ভার্জিল, খৃষ্টীয় পুরাণ অবলম্বনে মিলটন, পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে বাঙ্গলার মাইকেল, কবিবর হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার পুরাণ অবলম্বনে, পৌরাণিক গীতা বঙ্কিমচন্দ্রের দুইখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাসের ভিত্তি। যিনি পৌরাণিক গ্রন্থের বল জানেন না, তিনি কাগজ কলম ও ছাপাখানার বলে লইয়া সমালোচনা করেন, মনুষ্য জীবনের দায়িত্ব তিনি জীবনে বুঝেন নাই।"

কিন্তু নাটক লিখিবেন গদ্যে কি পদ্যে? গদ্য আনন্দরহো চলিলনা। তখন পদ্যের প্রতি লোকের আগ্রহ বেশী। মধুসূদনও ঠিকই বলিয়াছিলেন 'অমিত্রাক্ষর ছন্দই নাটকের ভাষা হওয়া উচিত।' লোক-প্রীতির জন্যই মধুসূদন 'পদ্মাবতী'তে কলির মুখে এই ছন্দের কবিতা দিয়াছেন। সুতরাং নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ দিতে গিরিশও উদগ্রীব হইলেন। ইতিপূর্ব্বে মাইকেল যে অমর ছন্দে কাব্যরচনা করিয়াছেন, নাটকের জন্য গিরিশের তাহা মনঃপূত হইল না। দীনবন্ধুও প্রায় কাছাকাছি গিয়াছিলেন—

"একি তাপসের মন! অচল, অটল
হরিণ নয়না—মুখ—পুণ্ডরীক হে'রে
এমন ব্যাকুল?"

কিন্তু তাহাও গিরিশচন্দ্রের পছন্দসই হইল না।

যখন তিনি নাটক রচনায় মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী ছন্দের কথা চিন্তা করিতেছিলেন, অকস্মাৎ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সার' প্রচ্ছদপটের কয়েকটি ছত্র তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হয়। লাইন কয়টি এই—

"হে সজ্জন!
স্বভাবের সুনির্ম্মল পটে
রহস্য রসের রঙ্গে—
চিত্রিনু চরিত্র দেবী সরস্বতী বরে
কৃপাচক্ষে হের একবার
শেষে বিবেচনামতে
তিরস্কার কিম্বা পুরস্কার যাহা হয়
দিও তাহা মোরে
বহুমানে লব শির পাতি।"

এই কয়টি ছত্রই হয় গিরিশের পথপ্রদর্শক, এবং সংসাহসে গিরিশচন্দ্র বরাবর সেই ঋণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই কয়টি ছত্রের অনুসরণে গিরিশচন্দ্র যে ছন্দে তাঁহার অমর নাটকাবলী সৃষ্টি করেন, তাহাই গৈরিশি ছন্দ। তিনি তাহা মধুসূদন বা দীনবন্ধু এমন কি অন্য কোন পূর্ব্বগামী বা পরবর্ত্তী নাট্যকার বা কবির নিকট হইতে ধার করিয়া লন নাই। তিনি উহার সন্ধান পাইয়াছিলেন একমাত্র কালী প্রসন্ন সিংহ হইতে। গিরিশ প্রবর্ত্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দই পরবর্ত্তী কবি ও নাট্যকারগণকে প্রভাবিত করিয়াছে, আর সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া অপরেশচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র কেহই উহার প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। বাবণবধের ভাষা যে কিরূপ সহজ এবং নীচ হইতে উচ্চস্বরে কিরূপ উঠিতে পারে, নিম্ন কয়েকটি ছত্র হইতে পাঠক সন্ধান পাইবেন—

মন্দোদরী—হায়, অভাগিনী আমি !

রাবণ—অভাগিনী তুমি !

পতিভাগ্যে ভাগ্যবতী নারী—
খুঁজে দেখ এ তিন ভুবন
কেবা আছে ভাগ্যবান মম সম !
যোগে যোগী যে চরণ ধ্যান করে
দিবানিশি যার গুণগান
করে পঞ্চানন পঞ্চাননে,
ব্রহ্মা যারে নাহি পায় ধ্যানে,
সে অখিলপতি
ব্রহ্ম সনাতন রাজীব লোচন
ধ্যানে জ্ঞানে হেরিছেন মোরে।

অন্যত্র রাবণ বলিতেছে—

করে ধরি ধনু করে,
ঘোর সিংহনাদে প্রবেশ করেছি রণে—
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর আদি চরাচর
কে কবে হ'য়েছে স্থির ?
যদি যায় প্রাণ মাতঃ ! করগো কল্যাণ
সেই দর্পে, সেই শরাসন করে
সেই রণক্ষেত্রে আনন্দ যথায় মম
হইব ধরণীশায়ী অনন্ত শয্যায় !

গিরিশচন্দ্রের এই নূতন ছন্দে সেই সময়কার—প্রবীণ সাহিত্যিকবৃন্দ সকলেই বিশেষ উৎসাহিত ও হর্ষান্বিত হইলেন। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গিরিশচন্দ্রের নব প্রবর্ত্তিত ছন্দে মুগ্ধ হইয়াই 'ভারতী'তে লেখেন (মাঘ ১২৮৮)।

"গিরিশবাবুর অমিত্রাক্ষর ছন্দই যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ, আমরা ইহার পক্ষপাতী। অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত না হইয়াও ইহা হৃদয়ের ছন্দ, তিনি আমাদিগকে প্রকৃতই সাহায্য করিলেন। ইহাতে ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা ও ছন্দের মিষ্টতা উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে।"

সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ও লেখেন "এতদিনে নাটকের ভাষা সৃজিত হইয়াছে।"

মধুসূদন তাঁহার কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াও প্রতি ছত্রে চতুর্দশ অক্ষর বজায় রাখিয়াছিলেন। এই চতুর্দশ অক্ষরে আবদ্ধ থাকিলে ছন্দের স্বচ্ছন্দগতি অনেক সময় ব্যাহত হয়। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের ভাঙ্গা ছন্দে তাহা হয় না। এই ছন্দ গিরিশ প্রবর্তন করেন দুই কারণে—

ছন্দ বাঁধাধরা নিয়মে না থাকিলে সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতি হয়, দ্বিতীয়তঃ স্বল্পশিক্ষিত অভিনেতাঅভিনেত্রীদের ভূমিকা আয়ত্ত করিবার পক্ষে সুবিধা হয়। এই সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়কে যে পত্র লেখেন তাহাতে একটি কৈফিয়তও দেন—

"তুমি যুদ্ধ না করলে কি হয়? আমি যুদ্ধ করেছি। যুদ্ধ আর কিছু নয়, গৈরিশী ছন্দের একটা কৈফিয়ৎ। গৈরিশী ছন্দ নিয়ে যে একটা উপহাসের কথা আছে তার প্রতিবাদ। প্রতিবাদ এই, আমি বিস্তর চেষ্টা করে দেখেছি, গদ্য লিখি সে এক স্বতন্ত্র কিন্তু ছন্দোবদ্ধ ব্যতীত আমরা ভাষা কথা কইতে পারিনা। চেষ্টা করলেও ভাষা কথা কইতে গেলেই ছন্দ হবে। সেই জন্য ছন্দে কথা— নাটকের উপযোগী। উপস্থিত দেখা যাক, কোন ছন্দে অধিক কথা হয়। দীর্ঘ ত্রিপদী লঘু ত্রিপদী বা যে ছন্দ বাঙ্গালায় ব্যবহার হয়, সকলগুলি পয়ারের অন্তর্গত। অমিত্রাক্ষর ছন্দ পড়িবার সময় আমার যেমন ভাঙ্গা লেখা, তেমনি ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে হয়। যেখানে বর্ণনা, সেখানে স্বতন্ত্র কিন্তু যেখানে কথাবার্ত্তা—সেইখানেই

ছন্দ ভাঙ্গা। তারপর দেখা যাউক কোন ছন্দ অধিক। দীর্ঘ ত্রিপদীর দ্বিতীয় চরণের সহিত শেষ চরণ মিলিত হয়ে অধিকাংশ কথা হয় :

'...দেখিলাম সরোবরে, কমলিনী বান্ধিয়াছে করী'। লঘু দ্বিতীয় চরণ ও শেষ চরণ অনেক মিলিত হয়।

...বিরস বদন, রাণীর নিকট যায়

এ সওয়ায় পয়ার, লঘু ত্রিপদীর এক এক পদ বিশেষতঃ শেষ পদ পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হয়। আমার কথা এই যে, এ স্থলে নাটকে চৌদ্দ অক্ষরে বাঁধা পড়া কেন? চৌদ্দ অক্ষরে বাঁধা পড়লে দেখা যায়, সময়ে সময়ে সরল যতি থাকেনা :—

'বীরবাহু অকালে, চলি যবে গেলা যমপুরে।

এইরূপ হামেসা-ই হবে। বাঙ্গালা ভাষায় ক্রিয়া 'হইয়াছিল' প্রভৃতি অনেক সময়েই যতি জড়িত করিবে। কিন্তু গৈরিশী ছন্দে সে আশঙ্কা নাই। যতি সম্পূর্ণ করিয়া সহজেই লেখা যাইবে।

আর এক লাভ, ভাষা নীচ হ'তে বিনা চেষ্টায় উচ্চস্তরে সহজেই উঠ্বে। সে সুবিধা চৌদ্দয় কিছু কম। কাব্যে তার প্রয়োজন নাই; কিন্তু নাটকে অধিকাংশ সময় তার প্রয়োজন।......"

অবশ্য এই ছন্দ গিরিশচন্দ্রের পরবর্ত্তী রচনা, পাণ্ডব গৌরব, সংনাম, শঙ্করাচার্য্য, তপোবল প্রভৃতি যাবতীয় নাটকে আরও প্রকৃষ্ট এবং সরস হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্র আরম্ভ হইতে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ছন্দের জন্য অবিমিশ্র সাধুবাদ ও যশ লাভে সমর্থ হইলেও, সত্তর বৎসর পরে আজ নূতন গবেষণা দেখাইয়া শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি অকস্মাৎ একটি তর্ক উত্থাপন করিয়া বলেন—

"ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তক-রূপে যে সম্মান রাজকৃষ্ণ রায়ের ন্যায্য প্রাপ্য, তাহা হইতে তিনি বঞ্চিত হইয়া আসিতেছেন। গিরিশচন্দ্রের জীবনীকারগণ প্রচার করিয়াছেন 'রাবণবধ নাটকে'

গিরিশচন্দ্রই ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন।" কিন্তু রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকের সহিত পরিচয় থাকিলে বা ইহার প্রকাশ কাল সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকিলে, তাহারা কখনই এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন না।"

ব্রজেন্দ্রবাবুর সিদ্ধান্ত খুবই ভ্রমাত্মক এবং সমস্ত ঘটনা না বুঝিয়া জীবনী লেখকগণের প্রতি অযথা অজ্ঞতা আরোপ করিয়া তিনি আরও একটি অমার্জ্জনীয় ত্রুটিতে পতিত হইয়াছেন। সমস্ত অবস্থা পাঠকের নিকট বুঝাইবার জন্য নিম্ন তালিকাটি প্রদান করিতেছি:

১৮৮১, ২১মে গিরিশচন্দ্রের 'আনন্দরহো' নাটকের অভিনয়

২৮ জুলাই—রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরধনুর্ভঙ্গ' প্রকাশ কাল

৩০ জুলাই গিরিশের 'রাবণবধ' অভিনয়—

'আনন্দরহো' নাটকের অভিনয় সমাপ্ত না হইতেই গিরিশচন্দ্র বাড়ী আসিয়া অমৃত মিত্র মহাশয়কে বলেন—

'শিবু, পৌরাণিক নাটক ছাড়া হবেনা, লিখো—

'ধর বৎস,—
ধর উপদেশ, রাখ বাক্য জননীর।"

অমৃত মিত্র মহাশয়ের ডাক নাম ছিল শিবু। অমৃতবাবু যখন গিরিশের শ্রুতিলিপি-লেখকের কাজ করিতেন। ইতিপূর্ব্বেই গিরিশ নাটকের উপযোগী ছন্দের সন্ধান পাইয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই রিহার্সেল আরম্ভ হয় এবং মুখে মুখে নূতন ছন্দের কবিতার আবৃত্তিতে উত্তর কলিকাতা মুখরিত হইতে লাগিল। দুইমাসের পূর্ব্বে কোন পঞ্চাঙ্ক নাটকেরই পাবলিক থিয়েটারে অভিনয়ই সম্ভব নয়, তাই আনন্দরহোর পরেই দুই তিনমাস রিহার্সেল দিয়া গিরিশ রাবণবধ নাটক ৩০ জুলাই মঞ্চস্থ করেন। নূতন অমিত্রাক্ষরে কথা থাকায়, অভ্যাসে আরও বেশী আয়াস করিতে হইয়াছে। রাজকৃষ্ণবাবুর

হরধনুর্ভঙ্গের প্রবেশকাল ২৮ জুলাই অর্থাৎ রাবণবধ অভিনয়ের দুইদিন পূর্ব্বে। সুতরাং একথা ব্রজেন্দ্রবাবু এবং মহাকবি গিরিশ চন্দ্রকে হেয় করিবার জন্য তাহার দলস্থ ব্যক্তিগণ ব্যতীত কেহই বিশ্বাস করিবেনা যে রাজকৃষ্ণবাবুর দুর্লভ বহি (নাটকখানা) বাহির হওয়ার দুইদিন মধ্যেই রাজকৃষ্ণবাবুর পুস্তকখানি কিনিয়া, পড়িয়া, তাহার ছন্দটি শিখিয়া নাটক লিখিয়া, তাহা রিহার্সেলে দিয়া কেহ তাঁহার রাবণবধ মঞ্চস্থ করিয়াছেন। এরূপ যুক্তি প্রলাপোক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয় কারণ নূতন রাবণবধ নাটকের অভিনয়ের ঘোষণাই অন্ততঃ পোনর বিশদিন পূর্ব্বে হইয়াছিল। অপর দিকে বরং সম্ভাবনা খুবই বেশী। কথাটা বুঝাইয়া বলিতেছি--

রাজকৃষ্ণবাবু নিজেই হরধনুভঙ্গ নাটকের ভুমিকায় লিখিয়াছেন—

"পাঁচ ছয় দিন মধ্যেই নাটকখানি আমি শেষ করি"

এই সময়ে রাজকৃষ্ণ বাবুর নিজস্ব একটা প্রেসও ছিল—উহার নাম বীণা যন্ত্র। সুতরাং একশত পৃষ্ঠার পদ্যের একখানি বহি নিজের কথায়ই ৫।৬ দিন লিখিতে ও নিজের মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত করিতে সর্ব্ব সমেত পোনর দিন লাগিতে পারে। আড়াই মাস পূর্ব্ব হইতে রাবণ বধ অভিনয়ের কথা ও কবিতার আবৃত্তি সর্ব্বত্র বিদিত হইয়াছে, সেই সন্ধানটুকু অবলম্বন করিয়া কোন কবি ও নাট্য-কুশলব্যক্তি নিজের বুদ্ধি ও মণীষার সহায়তায় যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত বহি বা নাটক বাহির করিতে পারেন তাহা অসম্ভব বা বিচিত্র নয়। সুতরাং রাবণ বধের অভিনয়ের মাত্র দুইদিন পূর্ব্বে প্রবেশকাল হইলেও রাবণবধই যে মৌলিক এবং নূতন অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম নাটক, এই সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক। আর যাহার নিজের প্রেস আছে সে পুস্তকে প্রবেশ কাল আগষ্ট মাসে হইলেও ২৮শে জুলাই তারিখ স্বচ্ছন্দে বসাইতে পারে, অড়াই মাসপূর্ব্ব হইতে অভ্যাস হওয়ায়, রাবণবধেই স্বচ্ছন্দগতি সাবলীল অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তনের সম্মান যে

গিরিশচন্দ্রেরই সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যেক বিচার সম্পন্ন ব্যক্তিই না করিয়া পারিবেন না। যদি রাজকৃষ্ণবাবু বা অন্য কাহারও নিকট গিরিশচন্দ্র আভাষ পাইতেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই উল্লেখ করিতে শৈথিল্য করিতেন না। স্বর্গীয় কালী প্রসন্ন সিংহের নাম তিনি কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিলেন, অন্যের নাম করিবেন না কেন? গিরিশচন্দ্র তো কখনও বলেন নাই যে ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দের তিনিই প্রবর্ত্তক! তবে তিনি "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" হইতে আভাষ পাইয়া নাটক রচনায় সেই ছন্দেরই ব্যবহার করিয়াছেন ও ক্রমে অপরিমিত যশার্জ্জন করিয়াছেন! সুতরাং গিরিশবাবুকে হেয় করিয়া অন্য কবিকে বড় করায় কোন অর্থ হয় না, সঙ্কীর্ণতাই প্রমাণিত হয়।

এই বিষয়ে নাট্যাচার্য্য অমৃতবসু মহাশয়ও লিখিয়াছেন—

"গিরিশবাবুর ছন্দের আবিষ্কর্ত্তা আর কেহ নহেন স্বয়ং কালীপ্রসন্ন সিংহ। সত্যপ্রিয় কৃতজ্ঞ গিরিশবাবু তাঁহার প্রথম নাটক রাবণ বধের Title Page এ হুতোম প্যাঁচার ঐ ছন্দে রচিত লাইন কয়টি তুলিয়া দিয়াছিলেন"।

অমৃতবাবু রাজকৃষ্ণ রায়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন, যদি রাজকৃষ্ণবাবুর ন্যায্য পাওনা হইত, অমৃতবাবু নিশ্চয়ই তাহা উল্লেখ করিতেন!

অতঃপরে ব্রজেন্দ্রবাবু কতকগুলি অবান্তর অনুমানের উপর তাহার সিদ্ধান্ত নির্ভর করিয়া আরও বিচারশূন্যতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে বলেন "হরধনুর্ভঙ্গের প্রকাশ কালের পূর্ব্বে উহা বঙ্গরঙ্গ ভূমিতে অভিনীত হইয়াছিল, ইহা নিতান্তই অলীক ও কাল্পনিক কথা। তিনি যদি পুরাতন কাগজাদি (যাহা হইতে লোকে তত্ত্বানুসন্ধান research করে) উল্লেখ করিতেন, স্বতন্ত্র কথা ছিল। কিন্তু তিনি প্রথার দোহাই দিয়াছেন, তিনি বলেন 'নাটক প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে রঙ্গালয়ে উহার অভিনয় হইয়া থাকে—ইহাই প্রথা। প্রথাতো হইতেই পারেনা— সম্ভবও নয়। কত কত নাটকের উদ্ভব হইয়াছে, সবগুলিই কি অভিনীত

হইয়াছে ? কোন কোন নাট্যকারের বেলা তাহা হয় বটে, যেমন গিরিশচন্দ্রের নাটকের। রঙ্গমঞ্চ তাঁহার অধীন ছিল বলিয়া তাহার সম্বন্ধে প্রথা হইতে পারে, আর তাঁহার পক্ষে সবই সম্ভব ছিল, কিন্তু অন্য নাট্যকারের পক্ষে তাহা নয়। তাহাদিগকে চেষ্টা করিয়া মুদ্রিত নাটক অভিনয় করাইতে হইত—সেও সব নাটকের নয়। সাধারণ নাট্যকারের কথা বলায় লাভ নাই। ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত নাটকের উল্লেখ করিয়াছি, সেইগুলির শতকরা ৯০খানি নাটকের অভিনয়ই হয় নাই, এমন কি সুপ্রসিদ্ধ দ্বিজেন্দ্রলালের বহু নাটক—রাণাপ্রতাপ, ভীষ্ম, পাষাণী, সীতা প্রভৃতি রচিত হইবার বহু পরে অভিনীত হইয়াছে। ভীষ্ম সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নাই, পাষাণী প্রবেশ-কালের বহুপরে নাট্যকারের মৃত্যুর প্রায় ১২ বৎসর পরে মনোমোহন নাট্যমন্দিরে প্রথমে অভিনীত হইয়াছে। ক্ষীরোদপ্রসাদেরও এইরূপ অনেক নাটক পরে অভিনীত হইয়াছে। এযুগেও রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটক প্রবেশকালের পরে মঞ্চস্থ হইয়াছে। কয়েকখানি হয়ই নাই। বিশেষতঃ ৺রাজকৃষ্ণ রায় তখন কোন থিয়েটারের সহিতই সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। তখন তিনি নব্য নাট্যকার। যে বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয়ের কথা ব্রজেন্দ্রবাবু প্রথা বলিয়া অনুমান করেন, উহার স্বত্বাধিকারী শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তখন বঙ্কিমচন্দ্রের, রমেশচন্দ্রের ও মধুসূদনের কাব্য ও উপন্যাস হইতে রূপান্তরিত নাটক ও অশ্রুমতী, পাষাণ প্রতিমা প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটকেরই পক্ষপাতী ছিলেন। ঐগুলিই তখন বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইতেছিল। আর তিনি মাইকেলের ছন্দের পরিবর্ত্তে অন্য ছন্দ ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন। রাজকৃষ্ণবাবু নিজেই লিখিয়াছেন "আমি এক সময়ে বঙ্গরঙ্গভূমির ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ও অসাধারণ নট চূড়ামণি ৺শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে ঐরূপ ছন্দের নাটক সৃষ্টি করিয়া অভিনয় করিতে অনুরোধ করি, তাহাতে তিনি বলেন, এখন মাইকেলের অমিত্রা-

করই চলুক্।" নাটকের প্রকাশ কালের পূর্ব্বে অভিনয় হইয়া থাকিলে নাটকে এই বিষয়ে উল্লেখ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার—নিশ্চয়ই থাকিত। বস্তুতঃ প্রহ্লাদ চরিত্রের পূর্ব্বে (১৮৮৪), বেঙ্গল থিয়েটারে রাজকৃষ্ণ বাবুর কোন নাটকই অভিনীত হয় নাই! গিরিশচন্দ্রের মুদ্রিত রাবণ বধ নাটকে, অভিনয়ের তারিখটির উল্লেখ আছে, কিন্তু রাজকৃষ্ণবাবুর হরধনুর্ভঙ্গ নাটকের অভিনয়ের তারিখ উল্লেখ নাই। পূর্ব্বে অভিনয় হইয়া থাকিলে নিশ্চয়ই উল্লেখ থাকিত।

মোটকথা বঙ্গীয় নাট্য-শালার পক্ষে গিরিশচন্দ্রের রাবণ বধের সঙ্গেই পৌরাণিক যুগের আরম্ভ। তখন বড় কেহ পৌরাণিক নাটক মঞ্চস্থ করিতে সাহস পাইত না। রাবণ বধ সম্বন্ধেও সকলের আশঙ্কা ছিল, তবে গিরিশচন্দ্রের রচনার গুণে উহা উৎরাইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয়ও লিখিয়াছেন—

"রাবণ বধ যেদিন প্রথমে অভিনীত হয় আমাদের বড়ই ভাবনা হইয়াছিল যে, পৌরাণিক নাটক মঞ্চে চলিবে কি না, কিন্তু...যখন রামচন্দ্রবেশী গিরিশচন্দ্রের জলদগম্ভীর কণ্ঠ হইতে শেষ দুই ছত্র—

"তারার চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য বিনে
কি পারে বিঘ্নিতে আর!"

উচ্চারিত হইল, তখন দর্শক মণ্ডলী ভক্তি বিহ্বল কণ্ঠে যেরূপ উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিলেন, তখন আমাদের মনে হইল, এ নাটক চলিবে, ভক্তিপ্রধান বাঙ্গালী তাহার জন্মগত সংস্কার ভুলে নাই—ধর্ম্মপ্রাণ জাতির মর্ম্মস্থান এ নাটক ঠিক স্পর্শ করিয়াছে।"

যে স্থানে রঙ্গমঞ্চ সর্ব্বাধ্যক্ষ গিরিশবাবুর নাটকেই তাহার সহকর্ম্মীদের ভাবনা উপস্থিত হয়, সে স্থানে ঐতিহাসিক নাটক প্রিয়

রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষের কাছে নব্য নাট্যকারের নূতন ছন্দে রচিত পৌরাণিক নাটক মতঃপূত হইতেই পারেনা, তাহা সহজেই অনুমেয়।

যাহা হউক সর্ব্বশেষে উল্লেখযোগ্য গিরিশচন্দ্র ও রাজকৃষ্ণবাবুর ছন্দেও অনেক পার্থক্য। রাজকৃষ্ণবাবু রচনা করিয়াছেন—

মহাদেব, দেব ত্রিলোচন
সমাধি করিয়া শেষ
লয়ে দেবগণে যাইতেছিলেন
সুখে বিলাসের স্থলে
হেনকালে সে অনঙ্গ তার চিত্ত মাঝে
উৎপন্ন করিলা ভ্রমে দারুণ বিকার

অন্যত্র—

বিশ্বমিত্র (পত্রপাঠান্তে)
বুঝিলাম লিপিমর্ম্ম।
শুন বৎস রঘুমণি
ধনুর্যজ্ঞ হবে মিথিলাতে মহাসমারোহে
নিমন্ত্রিত হৈনু আমি শিষ্যগণ সনে।
কালিপ্রাতে শুভযাত্রা করিব সকলে।

পূর্ব্বে বঙ্গরঙ্গভূমির অভিনেতাগণ মেঘনাদবধ যেমন গদ্যের মত করিয়া অঙ্গভঙ্গি করিয়া আবৃত্তি করিত, উদ্ধৃত কবিতাও সেইরূপ। রাজকৃষ্ণবাবুর সেরূপ ছন্দে নাটক লিখিবারই ইচ্ছা ছিল। তিনি নিজেই তাহা হরধনুর্ভঙ্গের ভূমিকায় লিখিয়াছেন। কিন্তু যে ভাষা সাবলীল এবং নীচ হইতে বিনা চেষ্টায় উচ্চস্তরে সহজে উঠিতে পারে, এরূপ ভাষা একমাত্র গিরিশচন্দ্রের ছন্দেই আছে। শ্রীযুক্ত

অজিত ঘোষ ঠিকই লিখিয়াছেন "গিরিশচন্দ্রের নাটকের ন্যায় রাজকৃষ্ণবাবুর নাটকে ভাব অনুযায়ী সুস্পষ্ট ভাষা বিভাগ নাই।"

ব্রজেন্দ্রবাবু এবং ডক্টর সুকুমার সেন রাজকৃষ্ণবাবু রচিত "নিভৃত নিবাস" কাব্যগ্রন্থে অমিত্রাক্ষর ছন্দের উল্লেখ করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের কয়ছত্রের সহিত ইহার তুলনাই হয় না। রাজকৃষ্ণবাবু নিজেই লিখিয়াছেন—"খণ্ডকাব্য প্রভৃতিতে ইহা এক ঘেয়ে হইয়া দাঁড়ায়।" যেমন তাঁহার রচনায় পাই—

"প্রিয়তমে—মনোরমে
ওঠ ওঠ বেলা হ'ল
ওঠ না হে
ওঠ না হে
থাক শুয়ে—থাক শুয়ে।
আমি কি নির্দ্দয়
হায়,
জানাই তোমায় তাই।"

ইহার আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

আর একজন সমালোচক এক অদ্ভুত আবিষ্কার করিয়াছেন। ডক্টর সুকুমার সেন বলেন "ব্রজমোহনের গীতাভিনয়ের রচনাভঙ্গির অনুসরণ গিরিশচন্দ্রের প্রথম পৌরাণিক নাটকগুলিতে দেখা যায়।" চমৎকার আবিষ্কার! ব্রজমোহন যাত্রার পালা বাঁধিতেন। তার কোন রচনাই তার জীবিতকালে প্রকাশিত হয় নাই। ১৩১৩ সালে ব্রজমোহন গ্রন্থাবলী বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে বাহির হয়। তাহার নামে আরোপিত তারকাসুর বধ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, লক্ষ্মণ বর্জ্জন প্রভৃতি তাহার রচিত না হইয়াও তাহার নামে চলে। গিরিচন্দ্রের প্রথম নাটকগুলি যে সময়ে রচিত হয়,

ব্রজমোহনের 'দানব বিজয়' প্রভৃতি প্রকাশিতই হয় নাই। কালের স্থিরতা রাখিয়া সমালোচনা করিলে আর হয়কে নয় করা যায় না। যাহাহউক গিরিশের রাবণবধের দুই একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াই আমাদের উক্তির সার্থকতা প্রমাণ করিতেছি যে কথাগুলি কিরূপ স্তরে স্তরে উঠিয়া অভিনয়ের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে, এবং এই সৌন্দর্য্য অন্যান্য নাটকে কিরূপে বৃদ্ধি পায়।

মন্দোদরী। হায় অভাগিনী আমি!
রাবণ। অভাগিনী তুমি।
পতিভাগ্যে ভাগ্যবতী নারী।
খুঁজে দেখ এ তিন ভুবন
কেবা আছে ভাগ্যবান মম সম!
যোগে যোগী যে চরণ ধ্যান করে,
দিবানিশি যার গুণগান
করে পঞ্চানন পঞ্চাননে
ব্রহ্মা যারে নাহি পায় ধ্যানে,
সে অখিলপতি
ব্রহ্ম সনাতন রাজীব লোচন
ধ্যানে জ্ঞানে হেরিছেন মোরে
জীবমাত্র বহে দেহ ভার
এ সংসারে মৃত্যুর অধীন সবে
কিন্তু হেন মৃত্যু—কে কবে লভেছে ভূমণ্ডলে।
এসেছেন গোলকের পতি
সহি জঠর যন্ত্রণা, বহি দেহ ভার
ছার রাবণ সংহার হেতু।

এই অপূর্ব্ব ছন্দে গিরিশচন্দ্রের লেখনী হইতে অসংখ্য পৌরাণিক ও ধর্ম্মমূলক নাটক বাহির হইয়াছে। এই সমস্ত পুস্তকের নিম্নে একটী তালিকা প্রদান করিলাম :—

	নাটকের নাম	প্রথমাভিনয়ের তারিখ	
১।	রাবণবধ	১৮৮১,	৩০ জুলাই
২।	সীতার বনবাস	,,	১৭ সেপ্টেম্বর
৩।	অভিমন্যুবধ	,,	২৬ নভেম্বর
৪।	লক্ষ্মণ-বর্জ্জন	,,	৩১ ডিসেম্বর
৫।	সীতার বিবাহ	১৮৮২,	১১ মার্চ্চ
৬।	ব্রজবিহার	,,	১২ এপ্রিল
৭।	রামের বনবাস	,,	১৫ এপ্রিল
৮।	সীতাহরণ	,,	২২ জুলাই
৯।	পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস	১৮৮৩	৩ ফেব্রুয়ারী
১০।	দক্ষযজ্ঞ	,,	২১ জুলাই
১১।	ধ্রুবচরিত্র	,,	১১ আগষ্ট
২।	নলদময়ন্তী	,,	১৫ ডিসেম্বর
১৩।	কমলে কামিনী	১৮৮৪	২৬ মার্চ্চ
১৪।	বৃষকেতু	,,	১৯ এপ্রিল
১৫।	শ্রীবৎসচিন্তা	,,	৭ জুন
১৬।	চৈতন্যলীলা	,,	২ আগষ্ট
১৭।	প্রহ্লাদ চরিত্র	,,	২ নভেম্বর
১৮।	নিমাই সন্ন্যাস	১৮৮৫,	১০ জানুয়ারী
১৯।	প্রভাসযজ্ঞ	,,	৯ মে
২০।	বুদ্ধদেব চরিত্র	,,	১৯ সেপ্টেম্বর
২১।	বিল্বমঙ্গল	১৮৮৫,	১২ জুন
২২।	রূপসনাতন	১৮৮৭,	২১ জুন

২৩।	পূর্ণচন্দ্র	১৮৮৮, ১৭ মার্চ্চ
২৪।	বিষাদ	,, ৫ অক্টোবর
২৫।	নসীরাম	,, ২৬ মে
২৬।	জনা	১৮৯৩, ২৩ ডিসেম্বর
২৭।	করমেতিবাই	১৮৯৫ ১৮ মে
২৮।	কালাপাহাড়	১৮৯৬, ২৬ ডিসেম্বর
২৯।	পাণ্ডব গৌরব	১৯০০, ১৭ ফেব্রুয়ারী
৩০।	শঙ্করাচার্য্য	১৯১০, ১৫ জানুয়ারী
৩১।	অশোক	,, ৩ ডিসেম্বর
৩২।	তপোবল	১৯১১, ১৮ নভেম্বর

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক ও ধর্ম্মমূলক নাটক ব্যতীত অপরাপর নাটকেও অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র কেবল সামাজিক নাটকে (প্রফুল্ল, হারানিধি, মায়াবসান, বলিদান, গৃহলক্ষ্মী ও শাস্তি কি শান্তি) এবং ঐতিহাসিক নাটক মিরকাশিম ও ছত্রপতি শিবাজীতে এই ছন্দ ব্যবহার করেন নাই। অন্যান্য সব নাটকেই, এমনকি ঐতিহাসিক নাটক চণ্ড, সৎনাম এবং সিরাজদ্দৌল্লা নাটকেও ইহার বহুল ব্যবহার দেখিতে পাই।

যাহা হউক, গিরিশচন্দ্রের নাটক সম্বন্ধে আমরা আগামী খণ্ডে আলোচনা করিব। এইবারে কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকাদি সম্বন্ধেই আলোচনা করিতে চাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের সম্রাট গিরিশচন্দ্রই ছিলেন। কিন্তু রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ও ভাঙ্গা ঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দেই তাহার নাটক রচনা করেন। যদিও গিরিশ-চন্দ্রের ছন্দে রচিত তাহার নিজের নাটকাবলী নানা গুণে এবং ছন্দের মাধুর্য্যে অমর হইয়া রহিয়াছে, তথাপি একথা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে মাধুর্য্য কম হইলেও রাজকৃষ্ণ রায়ের উত্তমও অন্যদিকে

প্রশংসনীয়। উভয় নাট্যকার অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তনায় মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতেন এবং রাজকৃষ্ণ বাবুর কবিতায় গদ্যের ছাপ থাকায় উভয় ছন্দে পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তাই বলিতেছি রাজকৃষ্ণ বাবু যে ছন্দ রচনা করিয়াছেন, তাহা তেমনভাবে সমাদৃত বা অন্য নাট্যকারগণের দ্বারা অনুসৃত না হইলেও, মৌলিকতা সম্বন্ধে তাঁহার যশ স্বীকার্য্য।

এক সময়ে রাজকৃষ্ণ বাবুর ভীষ্মের শরশয্যা, প্রহ্লাদচরিত্র, মীরাবাঈ, চতুরালী এবং নরমেধযজ্ঞ নাটকাদি থিয়েটারে ও যাত্রার আসরে এতই আদরণীয় হয় যে সর্ব্বত্র তাহার যশ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ নাট্যজগতে রাজকৃষ্ণ বাবুর অবদান কম নয়। তিনি বহু নাটক প্রণয়ন করেন, বীণা থিয়েটার সংস্থাপন করেন, থিয়েটারে নূতন সংস্কার সাধনে প্রয়াসী হন এবং ষ্টার থিয়েটারে নাটক সরবরাহ করিয়া কয়েক বৎসর ইহার যশ অক্ষুণ্ণ রাখেন। তাহার জীবনও অনেক সময় দুঃখময় হইয়াছে, দারিদ্র্য ছিল তাহার নিত্য সহচর। প্রতিভাবান কবি ও নাট্যকার দারিদ্র্য, চিন্তা, বিষাদ কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অনন্যসাধনায় কিরূপে মা সরস্বতীর ধ্যান ও পূজার নিরত থাকিতে পারেন, কবি রাজকৃষ্ণরায় তাহার জ্বলন্ত সাক্ষী। আজ শ্রদ্ধানত ভাবে তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা একান্ত কর্ত্তব্য বিধায় তাহা করিতেছি।

রাজকৃষ্ণ বাবুর আটখণ্ড গ্রন্থাবলীতে নাটকের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কতকগুলিই প্রসিদ্ধ—

প্রহ্লাদ চরিত্র (বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৮৪ ডিসেম্বরে অভিনীত হয়)

চন্দ্রহাস ১৮৮৭ সালে, হরিদাস ঠাকুর ১৮৮৮ সালে, মীরাবাঈ ১৮৮৯ সালে বীণা থিয়েটারে অভিনীত হয়।

চতুরালী চন্দ্রাবতী, ১৮৯০, লোভেন্দ্র গবেন্দ্র, লক্ষহীরা ১৮৯২ সালে এমারেল্ডে অভিনীত হয়। আর নরমেধযজ্ঞ ১৮৯১ সালে, লয়লামজনু

১৮৯১ সালে,বনবীর ১৮৯২ সালে এবং ঋষ্যশৃঙ্গ ১৮৯২ সালে বেনজীর বদ্রেমুনীর ১৮৯৩ সালে ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়।

এই সমস্ত নাটকের আলোচনার পূর্ব্বে রাজকৃষ্ণ বাবুর সাংসারিক ও কর্ম্মজীবনের ইতিহাস একটু বলা প্রয়োজন।

নানারূপ ভাগ্য বিপর্য্যয়ে রাজকৃষ্ণ বাবুর বাল্য ও অধ্যয়নের জীবন নানা কষ্টেই অতিবাহিত হয়। পরে অনুমান ১৮৭৬ সালে তিনি সামান্য বেতনে আলবার্ট প্রেসের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। অতঃপরে চাকুরী ছাড়িয়া মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটে 'বীণাপ্রেস' নামে একটি ছাপাখানা স্থাপিত করেন। ১৮৮১ সালে তাঁহার স্তবমালা নামে প্রথম কবিতাপুস্তক বাহির হয়। ইহার পরে তাহার নাটকাদি এই যন্ত্রেই মুদ্রিত হয়।

১৮৮৪ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে বঙ্গ রঙ্গভূমিতে তাহার প্রহ্লাদ চরিত্র নাটকের অভিনয় হয়। ইতিপূর্ব্বে গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলায়' ষ্টার থিয়েটার যেন ভক্তমেলায় পরিণত হইয়াছিল। রাজকৃষ্ণ বাবুও কয়েকমাস মধ্যেই হরিভক্তি সার করিয়া প্রহ্লাদ চরিত্র নাটক প্রণয়ন করেন। তবে চৈতন্যলীলাই যে 'প্রহ্লাদ চরিত্রের' পথপ্রদর্শক তাহাতে সন্দেহ নাই। নিম্নলিখিত দুইটি গান হইতেই তাহা প্রমাণিত হইবে।

গিরিশের চৈতন্যলীলায়—

কেশব কুরু করুণা দীনে, কুঞ্জ কাননচারী,
মাধব মনোমোহন, মোহন মুরলীধারী
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার।
ব্রজ কিশোর, কালীয়হর, কাতর ভয় ভঞ্জন
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকা হৃদি রঞ্জন
গোবর্দ্ধন ধারণ

বন কুসুম ভূষণ,
দামোদর কংস দর্পহারী।
শ্যাম রাস রস বিহারী
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার।

রাজকৃষ্ণবাবুর প্রহ্লাদ চরিত্রের গান—

হরিবোল বল মন আমার।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল
হরিবোল বল মন আমার
কেশব মধু মথন শ্যাম
মধুদাতা ভক্তিধাম
যোগিগণ প্রাণ আরাম
নয়নাভিরাম, করুণাধার
জয় জীব জীবন, মদন মোহন
ভবধর বন-কুসুম হার।

চৈতন্য লীলায় অনুপ্রেরণা পাইলেও, সহজকবি রাজকৃষ্ণ রায়ও যে হরি সম্বন্ধে ঐরূপ গান বাঁধিতে এবং গানে লোক রঞ্জন করিতে সক্ষম ছিলেন, তাহা প্রহ্লাদচরিত্রের জনপ্রিয়তায়ই অপূর্ব্ব ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ থিয়েটার ও যাত্রার মধ্যদিয়া প্রহ্লাদ চরিত্রের কথোপকথন ও সঙ্গীতের তখন সর্ব্বত্র আবৃত্তি হইত। বিশেষতঃ প্রহ্লাদের মধুমাখা গীত ও হরিভক্তি মূলক উক্তি সকলের হৃদয় স্পর্শ করিত।

কিন্তু অবিমিশ্র প্রশংসা লাভ করিলেও এই প্রহ্লাদ চরিত্রই রাজকৃষ্ণ বাবুর কাল হয়। প্রহ্লাদ চরিত্রের অভিনয়ে ৺বেহারীলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ রঙ্গ বঙ্গভূমির কর্ত্তৃপক্ষগণের যথেষ্ট অর্থাগম হয়। উক্ত কবি নিজেই লিখিয়াছেন "এক প্রহ্লাদচরিত্র নাটকের অভিনয়ে

লক্ষাধিক দর্শক হইয়াছে এবং বেঙ্গল থিয়েটার কোম্পানী পঞ্চাশ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন।”

কিন্তু প্রথমে অভিনয়ের বিশেষ আদর হয় নাই। রাজকৃষ্ণ বাবুর সঙ্গে কোম্পানীর সর্ত্ত ছিল যে প্রথম দশটি অভিনয়ের বিক্রয় লব্ধ অর্থের শতকরা দশটাকা তিনি পাইবেন। কিন্তু তেমন বিক্রী হয় নাই বলিয়া তিনি টাকাও পান নাই, আর থিয়েটার কর্ত্তৃপক্ষও কয়েকদিন পর্য্যন্ত তাহার অন্য কোন নাটক লয় নাই। পরে যখন প্রহ্লাদ চরিত্রের অভিনয়ে অপরিমিত লাভ হইতে থাকে, তিনি একশত টাকা মূল্যের কোম্পানীর একটি অংশ (Share) চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়। ইহার ফলেই তিনি ১৮৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে বীণা থিয়েটার সংস্থাপন করেন এবং সেইখানে চন্দ্রহাস, ভণ্ড দলপতির দণ্ড, কুমার বিক্রম, হরিদাস ঠাকুর, ভ্রান্তিবিলাপ প্রভৃতি নাটকের অভিনয় করেন।

রাজকৃষ্ণ বাবু থিয়েটারে স্ত্রীভূমিকা অভিনয়ের জন্য অভিনেত্রী না লইয়া বালকদের দ্বারা অভিনয়ের বন্দোবস্ত করেন। ইহাতে তিনি দুই বৎসরের মধ্যেই অত্যন্ত ঋণগ্রস্থ হইয়া পড়েন এবং স্ত্রীর অলঙ্কার পর্য্যন্ত বিক্রী করিতে বাধ্য হন। দুই বৎসর পরে রাজকৃষ্ণ বাবু স্ত্রী ভূমিকার জন্য অভিনেত্রী লইতেই প্রবৃত্ত হন। এবং ১৮৮৭ আগষ্টমাসে তাহার রচিত মীরাবাঈ নাটকে মীরার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েন প্রখ্যাত নাম্নী তিনকড়ি দাসী। কিন্তু বীণা থিয়েটার বেশীদিন আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ১৮৯০।৯১ সালে তাহার থিয়েটারগৃহ ও ছাপাখানা পর্য্যন্ত বিক্রী করিয়া তিনি বড় বড় মহাজনদের দেনা কোনরকমে পরিশোধ করেন। এই সময় তাহার অবস্থা এত শোচনীয় হইল যে ঋণের জ্বালায় তাহাকে অনেকের দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থীও হইতে হইয়াছিল। এমনও দিন গিয়াছে অধিকাংশ

সময় তিনি মৃত্যু কামনা করিয়া ভবজ্বালা হইতে অব্যাহতির জন্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু এই অক্লান্ত সাহিত্য সেবীর শেষাবস্থায় ভাগ্যাকাশে আবার একটু আলোর রশ্মি দেখা দিল। স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সহানুভূতিতে তিনি বাঁচিয়া গেলেন। ষ্টার থিয়েটারে এই সময় কোন নাট্যকার ছিল না। উহার প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তখন মধুপুরে কর্ম্মচ্যুতির নোটিশ প্রাপ্ত হন। গিরিশচন্দ্রের অভাবে উক্ত কোম্পানী রাজকৃষ্ণ বাবুকেই নাট্যকর করিয়া লইয়া যান। এইখানেই তিনি নরমেধযজ্ঞ, লয়লামজনু, বনবীর, ঋষ্যশৃঙ্গ ও বেনজীর বদ্‌রেমনে—কয়েকখানি নাট্যগ্রন্থ রচনা করিয়া ১৮৯৪ সালের ৫ই মার্চ্চ তারিখে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

রাজকৃষ্ণবাবুর সব নাটকের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে 'নরমেধযজ্ঞ' ও 'বনবীর' সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক। নরমেধযজ্ঞে দুইটী বিষয় উল্লেখনীয়। ভুক্তভোগী কবি রাজকৃষ্ণ ও কুশীদজীবি রত্নদন্তের চরিত্রটি বড় সরসভাবে চিত্রিত হইয়াছে। এইখানে একটু পরিচয় দিতেছি।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ, সিদ্ধার্থ, স্ত্রী, কাত্যায়নী ও তিনটি পুত্র জনার্দ্দন, অর্জ্জুন ও কুশধ্বজকে লইয়া এক পল্লীকুঠীরে বাস করে। কুশীদজীবী রত্নদত্তের অর্থগৃধ্নুতায় দরিদ্র সিদ্ধার্থের কিরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইয়াছে, নাট্যকার অতি সরসভাবে চিত্রটি দিয়াছেন। রত্নদত্ত সিদ্ধার্থকে বলিতেছে :—

এখন দোষাদোষ থাক্, একান্ন (৫১) আসল, আর সুদ সাড়ে তিনশো, সাকল্যে চারশো এক মুদ্রা ফেলে দিলেই তো সব গোল মিটে যায়—দোষ কেটে যায়।

সিদ্ধার্থ—ক্ষমা করুন, সুদ কোন মতেই দিতে পারবো না।

রত্ন—আসল ছাড়তে পারিতো সুদ ছাড়তে পারিনে। সুদ

আমার মায়ের দুধ, দুধ ছাড়লে বাঁচবো কি করে? সুদে আসলে কড়াক্রান্তিও বাদ দেবো না, সমস্তই বুঝে নেব।

সি—আমার অবস্থাতো আপনি জানেন?

রত্ন—আমার অবস্থাও তো তুমি জান?

সি—জানি, আপনার অবস্থা শরৎকালের শস্যপূর্ণক্ষেত্র, আমার অবস্থা গ্রীষ্মকালের দগ্ধ মরুভূমি।

রত্ন—আঃ, কি বল তুমি? মরুভূমির সঙ্গে ঋণের কারবার করে আমিও যে মরুভূমি হলেম, প্রাণ ওষ্ঠাগত হলো। মুদ্রা দাও, মুদ্রা দাও, মুদ্রা দাও।

সিদ্ধার্থ—ভিক্ষায় কিছুই সঞ্চয় হয় না, যা পাই, স্ত্রী, তিনটি পুত্র আর আপনার, একবেলাও খেতে কুলোয় না। বাড়ীখানি ছিল, এতে আপনাকে সুদের হিসাবে বিক্রয় করেছি। এখন বাস্তুভিটে ছেড়ে এই সামান্য কুটীর খানিতে সকলে মিলে অতি কষ্টে কাল যাপন করছি।

রত্ন—সুদের হিসাবে তোমার এই কুটীরখানিও অদ্য আমায় বিক্রয় কর।

সি—এতে আপনার কত সুদ শোধ হবে মহাশয়?

রত্ন—দু-চার মুদ্রাওতো হবে?

সি—এ দারুণ গ্রীষ্মে কোথায় থাকবো?

রত্ন—গাছতলায়।

* * * *

সিদ্ধার্থ—আর আমার উপায় নেই, কুটীর নিন, আমি চল্লেম।

রত্ন—বাকী প্রাপ্য?

সি—আমি মলে আমার হাড়-ক-খানা বিক্রয় করে নেবেন। জীবনে তো আর পারবো না।

রত্ন—আমি ছাড়বোনা, সাবধান, কুটীরে আর প্রবেশ করো না।

এইভাবে কুশীদজীবী রত্নদত্তের চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, এবং সে সিদ্ধার্থের নিকট হইতে আটবৎসরের কনিষ্ঠ পুত্রকে নরমেধ যজ্ঞার্থে লইয়া যায়। নিষ্ঠুর কুশীদজীবির নির্ম্মমতা রাজকৃষ্ণ বাবু যাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন, এখানে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃত ঘটনার সহিত সম্বন্ধ থাকায় উহা হৃদয়গ্রাহীও হইয়াছে। তবে নাটকে মহানন্দের হাতে রত্নদত্তের মৃত্যুতে অস্বাভাবিক বর্ণনা আছে। এই স্থানে যেন জোর করিয়াই তাহার পরিণতি প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এইরূপ মৃত্যু-কল্পনা ভাল হয় নাই।

'নরমেধ যজ্ঞে' যযাতির পিতৃভক্তি প্রকটিত। কিন্তু শিশুবধে শিশুর জন্য কাতরতাও বেশ ফুটিয়াছে। এই উভয়ের সংঘর্ষে যযাতি চরিত্র বেশ পুষ্ট হইয়াছে। যযাতি বলিতেছে—

যতবার জিজ্ঞাসি নারদে
ততবার বলে মুনি—ইহা ছাড়া
উপায় নাহিক কিছু আর।
হায় কেন আমি পিতা বর্ত্তমানে ত্যজি নাই
পাপ প্রাণ!
তা হ'লে এ হলাহল জর্জরিত করিত
কি মোরে?
ওহো, একদিকে পিতৃ স্বর্গবাস
অন্যদিকে শিশু-প্রাণ নাশ।

মোটের উপর 'নরমেধ যজ্ঞ' ষ্টার থিয়েটারে বেশ জমিয়াছিল, তবে স্থায়ী যশ রাখিবার মত এই নাটকে বিশেষ কিছু নাই।

রাজকৃষ্ণবাবুর 'বনবীর নাটকে' ধাত্রীপান্নার স্বার্থত্যাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। জগমলের ষড়যন্ত্র মন্দ হয় নাই। দুষ্টবুদ্ধি মিথ্যা ষড়যন্ত্রকারিণী শীতলসেনী চরিত্রে কেবল ইতরতাই প্রকটিত হইয়াছে। ডক্টর সুকুমার সেন বলেন 'বনবীরের মাতা শীতলসেনী লেডী ম্যাক-

বেথের অনুরূপ'। মনে হয় লেডী ম্যাকবেথের উন্নত চরিত্র সম্বন্ধে সমালোচকের ধারণা বড় ভাসা ভাসা। এদিকে বনবীরের চরিত্রে ম্যাকবেথের কতকটা ছায়া পড়িয়াছে সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি মোটেই পড়ে নাই। যে বনবীর পূর্ব্বে দৃঢ়ভাবে বলে—

আমি রাজ প্রতিনিধি শুধু
এই মোর অন্তরের কথা

তাহার এক সময়েই তিনটি ভাব উপস্থিত হয়—প্রথমে

বিক্রম যে ভ্রাতা মোর
চিতোরের রাজা

পরক্ষণে—

অবিশ্বাসী প্রত্যেক মানব
ভবে কোথা যাই

পরেও আবার সুদৃঢ় ভাবেই বলিতেছে—

এ দুই কণ্টক চূর্ণ হলে
আমি বই কেহ নাহি আর
চিতোর রাজ্যের অধিকারী

এই ঘাত প্রতিঘাত থাকায় অন্যদোষ সত্ত্বেও নাটকখানি প্রশংসার্হ।

রাজকৃষ্ণবাবুর 'বামনভিক্ষা','চন্দ্রহাস', 'মীরাবাই','হরিদাস ঠাকুর' 'লক্ষহীরা' প্রভৃতিতে উল্লেখযোগ্য বিশেষকিছু নাই। রাজা বিক্রমাদিত্য (১৮৮৪) কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হওয়ায় উহাকে ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে না। লৌহ কারাগারে (১৮৭৮) চিতোরের রাণা সঙ্গসিংহের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র বর্ণিত হইয়াছে। 'জগাপাগলা' 'কলির প্রহ্লাদ' রচিত না হইলেই ভাল হইত।

রাজকৃষ্ণবাবুর 'চতুরালী' ও 'লয়লা মজনু' উপভোগ্য গীতি নাটক। চতুরালীতে আয়ান ঘোষ, রাধিকা, কৃষ্ণ, জটিলা, কুটিলার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। লয়লা মজনুর ইবলিস্লাম ও মুন্নাবাঁদীতে গীতি নাট্যের দ্বৈতগানের আরম্ভ।

রাজকৃষ্ণবাবু নাটকের গান সহজে রচনা করিতে পারিতেন। সুকবি ও জনপ্রিয় নাট্যকার বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

বাঙ্গালা নাটকের উৎপত্তি ও বিকাশ

১। প্রাচীন ভারতের নাটক সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়ান ষ্টেজ' ও 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' গ্রন্থে আমি বিষদ্‌ভাবে দেখাইয়াছি যে, ভারতীয় নাট্যকলার বীজ বেদ ও উপনিষদাদি গ্রন্থে প্রচুরভাবে লক্ষিত হয়। নাট্যবেদ তখন পঞ্চম বেদরূপে কথিত হইত। প্রাচীন ভারতে নাট্যকলা, নাটক ও রঙ্গপীঠ কিরূপ উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছিল, 'ভরতের নাট্য-শাস্ত্রই' তাহার প্রমাণ। ভাস, কালিদাস, ভবভূতি শূদ্রক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাট্যকারগণও প্রাচীন গ্রন্থ ভরতের নাট্যসূত্রকে পবিত্র বেদ বা ধর্ম্মগ্রন্থরূপে মানিয়া লইয়া উহার নির্দ্দেশ পালন করিতেন। *

বস্তুতঃ ভারতীয় নাট্যকলা ভারতের নিজস্ব, ভারত ইহার জন্য কাহারও নিকট ঋণী নহে। নাটকের যবনিকাও হিন্দুরই সৃষ্টি।

ক্রমে মুসলমানের সময়ে ভারতীয় নাট্যকলা চরম অবনতির পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু সেই সময়েও শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা সহচর রূপগোস্বামীর ও পরমানন্দ সেনের কয়েকখানি নাটকই বাঙ্গলাদেশে নাট্যরস কতকটা সঞ্জীবিত রাখিতে সমর্থ হয়।

* 'As Christian principle rests on the precepts of the Church, and as the English Law is administered in agreement with precedent, so the Sanskrit Theatre has conformed to the rules laid down by the Bharata Sutras. They were held almost sacred by Kalidasa and other dramatists.

Vide 'Indian Theatre'. by E. P. Horrwitz Page—30-31

২। বাঙ্গালা নাটকের উৎপত্তি

এতদ্ব্যতীত পুতুলনাচ, কৃষ্ণযাত্রা, কবি, পাঁচালী, রামায়ণ গান হাফ্ আখ্ড়াই, কথকতা, বহুরূপী, হরবোলা প্রভৃতির জন্যই বাঙ্গালাদেশে অভিনয়কলার শেষ রশ্মিটুকু বিলুপ্ত হয় নাই। বস্তুতঃ যাত্রা প্রভৃতি তৎকালীন আমোদজনক গান ও কথোপকথন যে বাঙ্গালা নাটকের কতকটা পথপ্রদর্শক, তাহাতে সন্দেহ নাই। এদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ও শেষভাগে ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত প্লে হাউস ও ক্যালকাটা থিয়েটারে ইংরাজী নাটকের অভিনয় শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রাণে নাট্যরসের আকাঙ্খা জাগাইয়া দেয়। বাঙ্গালা নাটক সৃষ্টি-বিষয়ে ঐ সমস্ত ইংরাজী থিয়েটারের কাছে আমাদের ঋণ অবশ্য স্বীকার্য্য। তারপরে বাঙ্গালীর আত্মবোধও ছিল যে এই বিষয়েও সে ভূইফোঁড় নহে। তাই বাঙ্গলাদেশে বাঙ্গলা নাটক শীঘ্র শীঘ্র পুষ্ট হইয়া উঠে।

৩। গ্রীক নাটক ও উহার প্রভাব

অতঃপরে মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি বাহির হইতে বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন। প্রাচীন সভ্যতার যুগে ভারত ও গ্রীকদেশ নিজ নিজ সংস্কৃতিতে গরীয়ান হইয়া নাট্য কলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতিতে পরস্পর পরস্পরের মুখাপেক্ষী না হইয়াও উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। সংস্কৃত ব্যতীত গ্রীক নাট্যকার ইসকাইলাস, সফোকলস, ইউরিপিডিস ও এরেষ্টফেনিসও এই সমস্ত নাট্যকারকে সমভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। তাই বাঙ্গলার কমিডী ও ট্রেজিডি সমভাবে পুষ্টিলাভ করিয়াছে। অন্যদিকে আবার প্রসিদ্ধ সেক্সপিয়র এবং পরবর্ত্তী কালের ইবসেন, মেটারলিঙ্ক প্রভৃতিও সমভাবে সুবিধা প্রদান করিয়াছে। এই প্রাচ্য পাশ্চাত্য সংমিশ্রণে

বাঙ্গালা নাটক অল্পদিন মধ্যেই বাঙ্গলাকাব্য সাহিত্যের মতই গরীয়ান ও পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

সংস্কৃত নাটকের ন্যায় গ্রীক নাটকের উৎপত্তিও বড় চমকপ্রদ। সমবেত সঙ্গীত (Chorus) হইতে ইহার উৎপত্তি। গ্রীসে বেকাশ্ (Bachus) দেবতার উৎসব সময়ে অনেক সঙ্গীত গীত হইত। এরিষ্টোটলের মতে এই সব সঙ্গীত হইতেই নাটকের সৃষ্টি হয়।

প্রথমে হয় সঙ্গীত, তারপরে আসে কথোপকথন। খৃঃ পূঃ ৫৩৬ সালে থেস্পিস উহার প্রবর্ত্তন করেন। কতকটা আমাদের দেশের রামায়ণ গানের মত একজন মাত্র অভিনেতা থাকিত। কিছুদিন পরে ফ্রাইনিকাস্ তাহার Capture of Miletus নাটকে অভিনেতার স্থানে একজন অভিনেত্রীর মাত্র অবতারণা করেন। ক্রমে অভিনেতা ও অভিনেত্রীর যুগপৎ আবির্ভাব ঘটিতে থাকে।

৪। গ্রীক নাটকের ট্রেজিডি কমিডি

প্রথম ট্রেজিডি আরম্ভ হয় ইসকাইলাসের সময়ে এবং সফোকল্স্ ও ইউরিপিডিয়াসে উহার পরিপুষ্টি হয়। ইঁহারা রঙ্গমঞ্চেরও নানারূপ উন্নতি সাধন করিয়া ট্রেজিডির পরিপুষ্টি সাধন করেন।*

কমিডির সৃষ্টি হয় সুসারিয়েন (Susarian) হইতে ৫৮০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে। সাময়িক দোষ বিদ্রূপ করাতেই ইহার প্রারম্ভ। ইহারও বিকাশ হয় Epicharmusএ, আর পরিপুষ্টি হয় Aristophanesএ এখনকার প্রচলিত কমিডি আর গ্রীকদেশীয় কমিডিতে অনেক পার্থক্য। 'পূর্ব্বে কমিডি ছিল ট্রেজিডির বিপরীত, হাস্যরস ও ব্যঙ্গই ছিল ইহার প্রধান উপাদান।' এরিষ্টোফেনিস হইতে আমাদের প্রসিদ্ধ

I Æschylus, the Creator of Tragedy—author of the Persians,
Seven before Thebes, the Chophoræ or Electra
Epimenides or Furies
The Prometheus Bound
The Fire bringing Prometheus and Prometheus Unbound

কমিডিয়ান নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয়ের হাস্যরসাত্মক নাটকাবলীতে তখনকার কমিডির কতক পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই সব পাশ্চাত্য নাটক হইতে প্রাচীন হিন্দু নাটক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। *

৫। ইউরোপের অন্যান্য নাট্যকার

রোমানগণও ট্রেজিডির জন্য গ্রীকদিগের নিকট দায়ী।

পণ্ডিতপ্রবর শ্লেগেল বলেন—

"Of the ancient dramatists the Greeks alone are of any importance. In this branch of art the Romans were at first mere translators of the Greeks and afterwards imitators."

ফরাসী দেশের নাটকে গ্রীক নাটকের তিনটি ইউনিটির মত তিনটি ঐক্যতান Dramatic Unity আছে (১) নাটকে একটি মাত্র বিষয় থাকিবে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি উক্ত প্রধান বিষয়টি অবলম্বন করিয়া পুষ্ট হইবে (২) সমস্ত ঘটনাগুলি একস্থানে সংঘটিত হইবে (৩) সমস্ত ঘটনাগুলি একই কারণে একদিনে ঘটিবে।

জোডেলি Jodelle প্রথমে পাঁচ অঙ্কবিশিষ্ট একখানি ট্রেজিডি লিখিয়া ফরাসী সম্রাট দ্বিতীয় হেনরীর সম্মুখে অভিনীত করে।

II Sophocles—Antigone, the Electra, The Œdipus Tyrannus, Philoctetes. Ajax, Tracpiniœ,

III Euripides—The Electra. Iphigenia in Aulis. Media. the Mad Iphegenia in Tauris. Hercules etc. The Cyclops,

IV Aristophanes—Peace. Clouds. The Frogs.

* "And to pass to the other extremity of the world among the Indians. whose social institutions and mental cultivation descend unquestionably from a remote antiquity, plays were known long before they could have experienced any foreign influence. It has lately been made known to Europe that they possess a rich dramatic literature, which goes backward through nearly two thousand years."

[Dramatic Art and Literature by Augustus William Schlegel in 1879.]

তারপরে কর্ণেলি, মোলিয়ার Moliere, Racine, (রেসিনি), ভলটেয়ার Voltaire প্রভৃতি নাট্যরচনায় বিশিষ্টরূপে যশস্বী হইয়াছেন।

জার্ম্মাণীতে Lessing, Goethe, Schiller প্রভৃতি নাট্যকার প্রসিদ্ধ ছিলেন।

৬। ইংলণ্ডের নাটক

ইংলণ্ডের যাজকগণ ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্য হইতে দুই একটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া দুই একখানি নাটক রচনা করিয়া লোকশিক্ষার জন্য অভিনয় করিতেন। এই সব দৃশ্য-কাব্য দুই শ্রেণীর হইত Mysteries and Miracles (নিগূঢ় বিষয় অথবা অলৌকিক ঘটনা মূলক) অথবা Moralities (নীতিগর্ভ উপদেশ মুলক)—বাইবেলের অদ্ভুত ঘটনা অবলম্বনে প্রথম শ্রেণীর নাটক এবং কাল্পনিক ও প্রাকৃত ঘটনার সমবায়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটক রচিত হইত।

ইংলণ্ডের প্রথম নাটক Ralf Roister Doister. ইহা একখানি কমিডি, অধ্যাপক নিকোলাস উদল Nicolas Udall ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে রচনা করেন। ইহার দশবৎসর পরে নর্টন এবং Lord Buckhe-rest গর্বুদক (Gorbudoc) নামে প্রথম tragedy লেখেন। উহা অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত হয়। মার্লো তাহার নাটকাবলী এই ছন্দেই রচনা করেন। তৎপরে আভন নদী তীরবর্ত্তী ষ্ট্রাটফোর্ডের (Stratford on Avon) জগদ্বিখ্যাত সেক্ষপিয়র অমর নাটকাবলী লিখিয়া জগতের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের নাটকাবলীর জন্য আমরা এই সব দেশের নাট্যকারের নিকটও কিছু ঋণ স্বীকার করিতেছি।

অভিনয়ের প্রকারভেদ

নাটকের পরিচয় দিতে নাট্যশাস্ত্রানুযায়ী অভিনয়-সম্বন্ধেও কিছু উল্লেখ আবশ্যক। অভিনয়ের চারিটি প্রধান অঙ্গ যথা,—আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক।

আঙ্গিক অভিনয়ে অভিনেতাকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনায় ভূমিকাটির রস ও ভাবানুযায়ী অভিব্যক্তি ফুটাইয়া তুলিতে হয়।

১৯০১ সালে বাঙ্গালায় সম্ভ্রান্ত পরিবারের কয়েকজন ভদ্রলোক ও মহিলা শকুন্তলার মূক অভিনয় করিয়াছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহোদরা অমলাদেবী ও ভ্রাতৃবধূ বিমলাদেবী প্রভৃতি অভিনয় করেন।

আঙ্গিক অভিনয়ে অনাবশ্যক হস্তপদ সঞ্চালন করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। ছায়াচিত্রে এ শ্রেণীর অভিনয় অনেকেই দেখিয়াছেন।

বাচিক অভিনয়ে চরিত্রানুরূপ আবৃত্তি করিয়া চরিত্রটির অভিব্যক্তি দেখাইতে হয়। অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস, সুর, চীৎকার, হাস্যরসের ভূমিকা গম্ভীরভাবে, বিষাদান্ত অংশ রহস্যের ভাবে অভিনয় করিলে উহা নীরস ও বিরক্তিকর যে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বাভাবিক অথবা কলা সম্মত অভিনয়ই একান্ত আবশ্যক। আর্টের অযথা অপব্যবহার সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয় 'The best art is to conceal art.'

আহার্য্য অভিনয়ে দৃশ্য ও পোষাক চরিত্র ও ভাবাভিব্যক্তিতে সহায়তা করিবে। প্রফুল্ল নাটকের যোগেশ দুরবস্থার পরাকাষ্ঠায় ভিক্ষা করিবার সময় যদি বাবু পোষাকে করেন, অথবা চালা ঘর দেখাইতে গিয়া অট্টালিকার দৃশ্যের যদি অবতারণ হয় তবেই অভিনয় নষ্ট ও রসভঙ্গ হইবে। সিরাজদ্দৌলা যদি গ্রাম্যলোকের ন্যায় আলাপ করে আর নীলদর্পণের চাষা তোরাব বা রাইচরণ যদি ভদ্রলোকের মত কথা বলে, তবেই অশোভন হইবে। নাটকেও সেইরূপ ভাব ও কথোপকথন থাকাই একান্ত প্রয়োজনীয়।

সাত্ত্বিক অভিনয়ই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। ইহাতে যেমন স্বাভাবিক বা কলাসম্মত কথা বলিতে হইবে, যাহার যেরূপ কথা বলিতে হইবে তাহাও হস্তপদ সঞ্চালন স্বাভাবিক ভাবে করিতে সেইরূপ ভাবগম্ভীরতা অভিব্যক্ত হওয়া চাই। ভাবসম্পদ সম্বলিত স্বাভাবিক অভিনয়ই

সাত্ত্বিক অভিনয়। যোগেশ যখন বলে 'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল,' তাহাকে সেইরূপ বিষাদ সংযুক্ত ভাবই অভিব্যক্ত করিতে হইবে। মেক-আপও দরকার, কিন্তু তাহা বাহ্যিক। বাহ্যিকেরও দরকার আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক—মনোভাব, হৃদয়ের বেদনা, ক্রোধ, কারুণ্য, ভক্তি, সহানুভূতি প্রভৃতি রসের অভিব্যক্তি ও কণ্ঠস্বর আবশ্যক মত পরিচালনা করা। সঙ্গীত ও নৃত্যও এইরূপ ভাব সম্বলিত হওয়া চাই। **নাটক এরূপভাবে রচিত হওয়া আবশ্যক যেন আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের সুযোগ থাকে,** তাই নাট্যকারকে কাহিনী, চরিত্রসৃষ্টি, ঘটনা সমাবেশ, কথোপকথন, উপযুক্ত সঙ্গীত সংযোজন প্রভৃতি বিষয়েই সবিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে। আজকাল কোন কোন নাট্যকারকে দেখা যায় অনাবশ্যক প্রেমকাহিনী অথবা খাপছাড়া জাতীয়তামূলক কথা আওড়াইয়া পাঠকের বা দর্শকের মন হরণ করিতে চাহেন, তাই এখন নাটক এই সমস্ত মূলতত্ত্ব বিবর্জ্জিত হইয়া প্রকৃত নাটক হয় না, আর সাত্ত্বিক অভিনয়ও সম্ভব নয়।

সাত্ত্বিক অভিনয় আরও পরিস্ফুট হয় নাটকে যদি ঘাত প্রতিঘাত থাকে। To be or not to be—মনে যে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ আনে, লেডী ম্যাকবেথের পত্র পাঠ করিয়া ম্যাকবেথের যে বিরোধীয় ভাব পরিস্ফুট হয় তাহাতেই সাত্ত্বিক অভিনয়ের বিকাশ। মিরজাফর ক্লাইভের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া সাময়িক ভাবে হইলেও এদিক ওদিক যে ভাব দেখায়, বলিদানের করুণাময় বিবেকের বিরুদ্ধে অবস্থার তাড়নে দুলালের সঙ্গে জ্যোতির বিবাহের কনট্রাক্ট করিবার ভাবনাতেই উন্মাদ হইয়া যায়, নাটকে সেই সমস্ত ভাব ফুটাইতে পারিলেই সার্থকনামা নাটক অবশ্যম্ভাবী। ভরসা করি নাট্যকারগণ চারি প্রকার অভিনয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দৃশ্যকাব্য রচনা করিতে তৎপর হইবেন।

৮। সাহিত্যে নাটকের স্থান

'কাব্যেষু নাটকম্'—প্রকৃত নাটক কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জাতির প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, আশা, আকাঙ্খা উদ্দীপনা ও সমাজের মনোবেদনা, ধর্ম্মের তত্ত্ব, দর্শনের তথ্য যিনি নাটকীয় কল্পিত চরিত্রের ভিতর দিয়া ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে ও অন্তর্দ্বন্দ্বের রসের বর্ণচ্ছটায় দর্শকের হৃদয়াকাশে আদর্শের বিকাশ করিতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠকবি ও তাহার সৃষ্ট সাহিত্যই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঠিকই বলেন Drama is life presented in action—কর্ম্মক্ষেত্রে মানব আপনার শুভাশুভ আচরণে আত্মপ্রকাশ করে। সেই কর্ম্মপ্রবাহই নাটকে প্রতিধ্বনিত হয়, আর ইহার লক্ষ্যই চরিত্রের বিকাশ। প্রাচ্য পণ্ডিতগণেরও একই মত "প্রত্যক্ষ নেতৃচরিতো রসভাব সমুজ্জ্বলঃ।"

প্রাচীন হিন্দু-নাটক ছিল মিলনান্ত (Comedy) প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার সফোকলস প্রভৃতি লিখিতেন বিয়োগান্ত নাটক। সেক্সপিয়রের প্রসিদ্ধ কয়েকখানা নাটকও বিষাদান্ত। বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের নাটক মিলনান্তও আছে আবার তাঁহার সামাজিক নাটকগুলি ও সিরাজদ্দৌলা প্রভৃতি নাটক বিষাদান্ত ; তবে তিনি বলিতেন "মিলনান্ত নাটক অপেক্ষা করুণ রসাশ্রিত নাটক অধিকতর হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষাপ্রদ।"

৭। গিরিশ নাটক প্রাচ্য ও প্রতীচি সম্মিলনের ফল

গিরিশচন্দ্র সেক্সপিয়রের নাটক যেমন পড়িয়াছিলেন ও আয়ত্ত করেন, কোন দেশীয় অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ বোধ হয় তাহা করেন নাই। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় ম্যাক্‌বেথ নাটকের যে অনুবাদ করেন, বিশিষ্ট ভাষাবিদ্ অধ্যাপকগণের মতে, কোন ভাষায়ই ম্যাকবেথের ওরূপ প্রকৃষ্ট অনুবাদ হয় নাই। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যক্ষ মিঃ রো সাহেব ছাত্রগণকে সেক্সপিয়রের ম্যাকবেথ পড়িবার আগে

গিরিশচন্দ্রের ম্যাকবেথ পড়িতে বলিতেন। অনুবাদ যে কিরূপ প্রকৃষ্ট ছিল, দুই একটি স্থান হইতে পরিচয় দিতেছি :—

Where shall we three meet again
In thunder lightening and rain ?

গিরিশচন্দ্র ইহার অনুবাদ করেন—

দিদিলো বল্‌না আবার মিল্‌ব কবে তিন বোনে
যখন ঝড়্‌বে মেঘা ঝুপুর ঝুপুর
চক্‌ চকাচক্‌ হান্‌বে চিকুর
কড় কড়াকড়্‌ কড়াৎ কড়াৎ
ডাক্‌বে যখন ঝন্‌ঝনে ?

When the hurly, burly done
When the battle's lost or won

যখন বাধবে মাতবে, হারবে
জিন্‌বে থাম্‌বে লড়াই রণরণে

1st witch—Where to meet ?

কোনখানে বোন কোনখানে
ঠিকঠাক বলে দেলো যেতে হবে কোনখানে ?

2nd—Upon the heath
3rd—There to meet Macbeth.

২য় ভুষণো রাঁড়ীর মাঠে যাব
৩য় ম্যাকবেথেরে দেখা দেবো ঘাপটি মেরে একাকোণে

ম্যাকবেথে আছে—

A sailor's wife had chestnuts in her lap
And she munch'd and munch'd and munch'd.

এলো চুলে মাগার মেয়ে ব'সে উদোম গায়
কোর কোঁচড়ে ছেঁচা বাদাম চাকুম্ চুকুম্ খায়।

আর একস্থানে আছে—

ম্যাক্‌বেথ ডাক্তারের কাছে স্ত্রীর অসুখের কথা শুনিয়া নিজের কথা বলিতেছে—

Canst thou not minister to a mind diseased
Pluck from the memory a rooted sorrow ;
Raze out the written troubles of the brain
And, with some sweet oblivious antidote
Cleanse the stuff'd bossom of that
perilous stuff
Which weighs upon the heart ?
Doctor—There-in the patient must minister to himself

পার নাকি মনোব্যাধি করিতে মোচন
স্মৃতি হ'তে উৎপাড়িতে নহে কি হে তুমি
দুরন্ত সন্তাপ বদ্ধমূল ?
অগ্নিবর্ণে—থরে থরে মস্তিষ্ক মাঝারে
লেখা অনুতাপ লিপি—
আছে কি কৌশল তব মুছিবারে তার ?
অন্তর সরল যার প্রবল পীড়নে !
ব্যথিত হৃদয়াগার—
বিস্মৃতি অমৃতবারি করি দান
ধৌত কর—পারো যদি—।
ডাক্তার—এ ভীষণ রোগে মাত্র রোগীই ভিষক্

অতিরিক্ত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

৮। নাটকে পঞ্চ-সন্ধি

যাহাহউক সেক্সপিয়র সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াও গিরিশচন্দ্র ভারতীয় নাট্যবিধি পঞ্চসন্ধি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। প্রাচ্য আলঙ্কারিকগণ পঞ্চসন্ধিসমন্বিত হইলেই নাটককে প্রকৃত নাটক বলিতেন—

"নাটকং খ্যাতবৃত্ত স্যাৎপঞ্চসন্ধি-সমন্বিতম্"

এই পঞ্চসন্ধি কি ? মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংহৃতি এই পঞ্চসন্ধি। ইংরাজীতেও নাটকের পাঁচটি বিধি আছে :

(১) Protasis আখ্যানের প্রারম্ভ ভাগ

(২) Epilatis বিরুদ্ধগতি

(৩) Catastasis পুষ্টি

(৪) Peripateia বিরাম

(৫) Catastrophe উপসংহার।

আর সংস্কৃত মতে প্রথম মুখে ঘটনার উৎপত্তি বা বীজবপন, দ্বিতীয়ে প্রতিকূল অবতারণা, তৃতীয়ে গর্ভে অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার সংঘর্ষ,চতুর্থে বিঘ্ন সমাগম ও অতিক্রম, পঞ্চমে পরিণাম ফল। প্রাচ্য প্রতীচ্যের ভাব সম্মেলন ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের অভ্যুদয়, আর তাঁহার নাটকে পাশ্চাত্য নাটকের প্রভাব থাকিলেও তিনি নাটকে প্রাচ্য অলঙ্কার শাস্ত্রই মানিয়া চলিয়াছেন। তাই ইংরাজী নাটকের ন্যায় তাহার নাটকের তৃতীয় অঙ্কেই ঘটনার পুষ্টি হয় নাই। ম্যাকবেথের তৃতীয় অঙ্কে ভোজদৃশ্য ও প্রেতাত্মা দর্শন অর্থাৎ একেবারে পুষ্টি, কিন্তু গিরিশের বলিদান, প্রফুল্ল, সিরাজদ্দৌলা প্রভৃতি নাটকের তৃতীয় অঙ্কে সেইরূপ পুষ্টি হয় নাই, হইয়াছে অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার সংঘর্ষ। বলিদান নাটকের প্রথমাঙ্কে করুণাময় যে বলিতেছে 'অদৃষ্টে তো দিব্য চক্ষে দেখ্‌ছি গাছতলা,' তুমি কি মেয়ের বিয়ে দিতে পথে বস্‌তে চাও?' —ইহাই নাটকীয় বীজ।

প্রথমাঙ্কে বীজবপন ও ঘটনার সূচনা-করুণাময় ধার করিয়া প্রথমা কন্যা কিরণময়ীর বিবাহ দেন। বর বয়াটে, দুশ্চরিত্র।

দ্বিতীয় অঙ্কে প্রতিমুখ—প্রতিকূল অবস্থায় অবতারণা। দুলাল বিবাহ করিতে চায়, মদমত্ত মোহিতকে বিবাহ সভায় আনা হয়। বিবাহ সভায় ভয়ানক গণ্ডগোল হয়, জোবির চেষ্টায়ও বিশেষ কোন ফল হয় না।

তৃতীয় অঙ্কে—অনুকূল প্রতিকূল অবস্থার সংঘর্ষ। মোহিতের স্ত্রী কিরণময়ীকে লইয়া দুলালবাবুর হাতে দিবে, আর বেহারাদের

চেষ্টায় কিশোর আসিয়া পড়ায় কিরণ্ময়ী রক্ষা পায়। করুণাময়ের কন্যার প্রতি স্নেহ ও রাগ অভিমানের সংঘর্ষ। তাই ছেলের স্কুলের মাহিনা মেয়েকে দিয়া দেয়, বড় মেয়েকে ভয়ানক তিরস্কার করে।

চতুর্থ অঙ্কে—করুণাময়ের চাকরী যায়, রূপচাঁদের চক্রান্তে আরও বিপদ ঘটে, সদ্য বিধবা কন্যা হিরন্ময়ীকে তিরস্কার করেন, হিরন্ময়ী আত্মহত্যা করে, কিন্তু সমস্ত বিপদের ত্রাণ কর্ত্তারূপে কিশোর আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হয়।

পঞ্চম অঙ্কে—নায়ক নায়িকা চিত্রের চরম বিকাশ, অপরিবর্ত্তনীয় পরিণতি ও ঘটনার বিরাম।

করুণাময় ও সরস্বতীর মৃত্যু, ধনী ঘনশ্যাম পুত্র শিক্ষিত কিশোরের সহিত তৃতীয়া কন্যা জ্যোতির বিবাহ, মোহিতের চরিত্রের পরিবর্ত্তন ও কিরন্ময়ীর সহিত পুনর্ম্মিলন। ঘনশ্যাম কর্তৃক করুণাময়ের পুত্রের ভার গ্রহণ।

নাটকের আবশ্যকীয় বিশ্লেষণ করিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। 'নাট্যকার' সম্বন্ধে গিরিচন্দ্রের মতামত এখানে বিশেষ উল্লেখনীয় মনে করি। তিনি বলেন—

(১) মানবহৃদয় স্পর্শ করা কলাবিদ্যার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভিন্নদেশে তাহার আকার কতক পরিমাণে ভিন্ন। একদেশের নাটক অপরদেশের নাটকের সহিত তুলনায় সমালোচনা হইতে পারেনা। দার্শনিক জার্ম্মান সিলার নাটকে ভার্জিন মেরীর অবতারণা করিয়া উচ্চ জোয়ান অব আর্ক নাটক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সেই ভাবে সেক্সপিয়রের নাটক রচিত নয়।

(২) যিনি নাটক লিখিবেন, দেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। তাহাকে দেশীয় স্বভাব শোভা, দেশীয় নায়ক নায়িকা, দেশীয় অবস্থা, উপস্থিত ক্ষেত্রে দেশীয় মানব-হৃদয় স্রোত তাহাকে দৃঢ়রূপে মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে হইবে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ধর্ম্মপ্রাণ নাটকেরই

স্থায়ী আদর করিবে। বস্তুতঃ জাতীয় ভাবাপন্ন না হইলে উচ্চাঙ্গের জাতীয় নাটক লেখা যায়না।

(৩) আত্মগোপন একান্ত আবশ্যক। ঔপন্যাসিকের যে সুবিধা, নাট্যকারের তা নয়। পোর্সিয়া বিচারালয়ে নাট্যোল্লেখিত ব্যক্তিদিগের নিকটে আত্মগোপন করিয়াছে, কিন্তু দর্শকের নিকট নয়। আইনজ্ঞ বেশে কে আসিল তাহার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক নয়, কিন্তু আইনজ্ঞবেশে পোরসিয়া উপস্থিত, তাহা নাট্যকারকে বলিয়া দিতে হইবে। সুতরাং আকাঙ্খা ও চমৎকারিতা উৎপাদন করা নাটককারেব এক স্বতন্ত্র কৌশল। এ কৌশল সাধারণ শক্তি উদ্ভূত নয়। আত্ম-গোপনই নাটক কারের জীবন।

(৪) ঔপন্যাসিক বা কবি গল্পের ভিত্তি বর্ণনা করিতে পারেন, সমস্ত অবস্থাই তাঁহার আয়ত্তাধীন, কিন্তু নাটককারকে হৃদয়ের ঘাত প্রতিঘাতের আমূল গল্প করিতে হইবে।

(৫) যথায় উৎকট সমস্যাস্থল, তথায় নাটককারকে আবরণ খুলিয়া মনোভাব দেখাইতে হইবে। হ্যামলেট আত্মহত্যা করিবে কিনা তাহা বিরলে বসিয়া ভাবিতেছে বলিলে চলিবে না, তাহার জড়িত মস্তিষ্কে কিরূপ জড়িত ভাব প্রসূত হইতেছে তাহাও দেখাইতে হইবে।

(৬) প্রত্যক্ষানুভূতি ভিন্ন নাট্যকার কোন চরিত্রই অঙ্কিত করিতে পারেন না। নানারূপ অবস্থায় তাহার ভিন্ন ভিন্ন ভাব বিকাশ হয় মাত্র। তাই নাটক রচনায় অভিজ্ঞতা একান্ত আবশ্যকীয়।

আগামী খণ্ডে আমরা গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি নাট্যকারের এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করিব। অন্যান্য নাট্যকারগণ সম্বন্ধেও (যাহারা বাদ গিয়াছেন তাহারা সমেত) আলোচনায় বিরত হইব না।

সমাপ্ত

বর্ণানুক্রমিক সূচী